রূপমঞ্জরী

রূপমঞ্জরী

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

সাহিত্য
৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২

শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মিত্র

কল্যাণীয়েষু

সম্প্রতি প্রকাশিত লেখকের কয়েকটি বই

জলপ্রপাত । উত্তর পুরুষ । একটি নায়িকার উপাখ্যান

চোরাবালি । অঙ্গীকার । দেবযানী । সভাপর্ব

রূপমঞ্জরী

প্রহর খানেক রাত হয়েছে কি হয় নি এরই মধ্যে বাঁশ ঝাড়ের আড়ালে সমস্ত পাড়ার বাড়িগুলি একেবারে নিঝুম হয়ে গেছে। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নেই। জ্ঞাতিভাই ভুবনের পোড়ো ভিটা পেরিয়ে গগন ঢুলী নিজেদের উঠানে এসে দাঁড়াল। একবার তাকাল মেয়ের ঘরের দিকে। ঝাঁপ এঁটে নিশ্চিন্তে ঘুমাচ্ছে মেয়ে। মনের রাগে একটু দাঁত কিড়মিড় করল গগন। তারপর নিজের ঘরের সামনে গিয়ে ক্লান্তস্বরে ডাকল, 'কই গো নন্দর মা, ঝাঁপ খুলে দাও।'

ভারি পাতলা ঘুম লক্ষ্মীর। স্বামীর ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে বসল। পিঠ চাপড়ে ছেলেকে ঘুম পাড়াতে গিয়ে কখন নিজেরও একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। তাড়াতাড়ি দিয়াশলাইএর কাঠি জেলে দীপের সামনে ধরল লক্ষ্মী। কিন্তু সলতে রয়েছে একেবারে দীপের মধ্যে। নিবাবার সময় নিজেই লক্ষ্মী টেনে রেখেছিল। ফুঁ দিয়ে তো নিবাতে নেই তাতে অকল্যাণ হয় গৃহস্থের। সলতের মুখ পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতে পোড়াছাই কাঠি গেল নিবে। দুবারের বার লক্ষ্মী কাঠি ধরাতে যাচ্ছে, অসহিষ্ণু গগন ধমক দিয়ে উঠল বাইরে থেকে, 'বলি হল কি, মরে রয়েছিস নাকি ঘরের মধ্যে!'

গগনের ক্লান্ত গলা এবার কর্কশ আর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে।

পরমুহূর্তেই দীপ জেলে ঘরের ঝাঁপ খুলে লক্ষ্মী দাওয়ায় নেমে মিষ্টি কণ্ঠে বলল, 'এসো।'

ভারি ঠাণ্ডা মেজাজ লক্ষ্মীর। বকে ধমকে গালাগালি দিয়ে সহজে তাকে রাগানো যায় না।

কিন্তু গগনের রাগ তখন পড়ে নি। 'এতক্ষণে ঘুম ভাঙল বুঝি। বলি ঘুমিয়েছিলি না মরেছিলি?'

প্রৌঢ় স্বামীর গালাগাল শুনলে আজকাল আর দুঃখ হয় না লক্ষ্মীর, বরং মুশকিল হয় হাসি সামলানো নিয়ে। রাগের সময় লক্ষ্মীর মুখে হাসির আভাস দেখলে গগন ভারি চটে যায় আর গগন যত চটে লক্ষ্মীরও হাসি পায় তত বেশি। এখনও ঠোঁট টিপে হাসি চাপল লক্ষ্মী তারপর বলল, 'কি যে বল, মরব কেন। ভিন গাঁয়ে গেছে ঘরের মানুষ, এতখানি রাতেও ফিরছে না, তারজন্যে ভাবনা

চিন্তা নেই শরীরে যে মরব। গাল দিয়ো পরে। আগে খবর শুনি। যেজন্য গেছলে তার কি হল বল। পেলে নাকি সনাতনের দেখা।'

দাওয়ায় উঠে বিরস মুখে তামাক সাজতে বসল গগন। তারপর কর্কশস্বরে বলল, 'না না। পেলে তো বলতামই। গাঁয়ে নেই সনাতন। বায়না পেয়ে বাজাতে গেছে হরলালের দলের সঙ্গে।'

লক্ষ্মী এবার শঙ্কিত হয়ে বলল, 'তাহলে উপায়? তোমার বায়নার কি হবে?'

হুঁকো টানতে টানতে গগন উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'ন্যাকামি করিস নি মাগী। কি হবে জানিস নে। বেকুব বেল্লিক বনতে হবে লোকের কাছে, বেইজ্জৎ হতে হবে।'

গগন জোরে হুঁকোয় আরও কয়েকটা টান দিয়ে বলল, 'কিন্তু এর শোধ আমি না তুলে ছাড়ব না বলে দিচ্ছি। যাদের জন্যে আমাকে মুখ হারাতে হল তাদের মুখ আর আমি ভোরে উঠে দেখব না। রাত পোয়াতে না পোয়াতে যেন ওরা আমার ভিটে ছেড়ে চলে যায়। ভরত ঢুলীর ঘর যেন আমার ভিটের ওপর আর না থাকে কাল।'

লক্ষ্মী সভয়ে বলল, 'থামো, থামো, খেয়ে-দেয়ে আগে ঠাণ্ডা হয়ে নাও তারপর কি করা যায় না যায় ঠিক করো।'

সশব্দে ঘরের ঝাঁপ খুলে উঠান পেরিয়ে সিন্দুর ততক্ষণে একেবারে বাপের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে।

'বাবা।'

গগন একটু চমকে উঠে কেমন যেন থতমত খেয়ে গেল। ফিকে অন্ধকারে একখানা ধারাল তরবারি যেন তার সামনে ঝলসে উঠেছে।

সিন্দুর বলল, 'কি দোষ করেছি আমরা যে রাত দুপুরে এসে অমন গালাগাল শুরু করেছ। পান থেকে চুন খসলেই দিনের মধ্যে সতেরবার তুমি আমাদের ভিটে থেকে তুলে দাও আর ঘর ভাঙো। বেশ তো, তোমার জামাই আসুক বাড়িতে তখন বলো এসব কথা। ক্ষেমতা থাকে তখন ভেঙো ঘর, তুলে দিয়ো ভিটে থেকে। খালি বাড়ি পেয়ে কেবল মেয়েমানুষের কাছে মিথ্যে চেঁচামেচি করছ কেন।'

ক্ষমতার কথায় গগন যেন একেবারে ক্ষেপে উঠল। 'কি, আমার ক্ষেমতা নেই বলছিস? আমার ভিটেয় থাকবি আর আমাকেই তাচ্ছিল্য করবি?

আজই যদি তুলে দিই ভিটে থেকে কি করতে পারিস শুনি। ভারি মানওয়ালী হয়েছিস না? ঘরজামাইয়ের মাগের আবার মান?'

লক্ষ্মী করুণ চোখে একবার সিন্দুরের দিকে তাকাল তারপর অনুনয়ের সুরে বলল, 'তুমি ঘরে যাও মেয়ে। বুড়ো মানুষের সব কথায় কি আর কান দিতে হয়।'

গগনের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লক্ষ্মী। বয়সে সিন্দুরের চেয়ে দু'তিন বছরের ছোটই হবে। সিন্দুর কখনো তাকে নাম ধরে ডাকে কখনো বলে, বউ। কিন্তু লক্ষ্মী তাকে—মেয়ে ছাড়া ডাকে না। কেবল সতীনের মেয়ের প্রভাব প্রতিপত্তির ভয়েই নয়, সিন্দুরকে লক্ষ্মী মনে মনে ভালও বাসে। রাগ হলে ভারি কড়া কড়া কথা বলে সিন্দুর। বাপের মতই গালাগাল করে কিন্তু মেজাজ যখন আবার ভালো থাকে, লক্ষ্মীর গলা জড়িয়ে ধরে সোহাগ জানাতেও তার জুড়ি মেলে না। কানে কানে ফিসফিস করে অনেক কথা বলে তখন সিন্দুর। স্বামীর আদর-আহ্লাদের অনেক গোপন আর নতুন পদ্ধতির কথা লক্ষ্মীকে সে শোনাতে থাকে। হিংসা যে এক-আধটু লক্ষ্মীর না হয় তা নয়, কিন্তু লজ্জা যেন আরও বেশি হয়ে ওঠে, মৃদু কণ্ঠে নিষেধ করে,'থামো থামো। আমি না সম্পর্কে মা হই তোমার।'

সিন্দুর ঠোঁট উলটে বলে, 'ঈস, মা না আরও কিছু, সই, তুই আমার সই হোস লক্ষ্মী। সই ছাড়া মনের কথা আর কার কাছে কই বল্।' বলতে বলতে লক্ষ্মীকে দু'হাত দিয়ে জাপটে ধরে সিন্দুর।

লক্ষ্মীর সর্বাঙ্গ শিরশির করে ওঠে। অমন সুন্দরী মেয়ের বাহুবন্ধের ভিতর থেকে নিজের মিশ কালো রঙ আর চেপটা নাক মুখের জন্য লক্ষ্মীর কুণ্ঠার যেন অবধি থাকে না। সত্যি, এমন রূপ নিজেদের জাতের মধ্যে আর কারো দেখে নি লক্ষ্মী। এই নিয়ে পাড়ার অবশ্য অনেকেই অনেক রকম কানা-কানি বলা-বলি করে, সিন্দুর না কি পুরোপুরী ঢুলীদের জাতের মেয়ে নয়। কিন্তু লক্ষ্মী ওসব অকথা কুকথায় কান দেয় না। ওসব নিশ্চয়ই হিংসার কথা। সিন্দুরকে দেখে পাড়ার কোন্ মেয়ের না হিংসা হয়। কেবল লক্ষ্মীর হয় না। তার রূপের দিকে চোখ মেলে চেয়ে থাকতে ইচ্ছে করে লক্ষ্মীর।

কিন্তু রাগলে সিন্দুর একেবারে অন্যরকম মূর্তি ধরে। তখন বাপের মতই কোন কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান থাকে না তার।

আজও লক্ষ্মীর কথার জবাবে সিন্দুর একেবারে জ্বলে উঠল, 'থাক থাক দরদ

দেখাতে হবে না। চিনতে আর বাকি নেই কাউকে। দু' চোখের বিষ হয়েছি আমরা। তুলে দিতে পারলেই বাঁচো। কিন্তু সিন্দুরকে তোলা অত সহজ নয়।'

হতভম্ব হয়ে চুপ করে রইল লক্ষ্মী। জবাব দিল গগন, 'তুলব না করব কি শুনি। খুব তো ফটফট করছিস। ভরত জাত-ব্যবসা ছেড়ে দিল আর তুই একবার মানা করতে পারলি নে তাকে।'

গগনের গলায় অভিযোগ আছে কিন্তু আগের মত তেমন তীব্র শাসানি আর নেই।

সিন্দুর তীক্ষ্ণ কণ্ঠে প্রতিবাদ করে উঠল, 'কে বলেছে তোমাকে জাত ব্যবসা ছেড়েছে সে ?'

গগন বলল, 'ছেড়ে দেওয়া ছাড়া কি। এর আগের বারেও তো তাকে দরকারের সময় পাই নি। ধূল গাঁয়ের সনাতনকে দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। আচ্ছা জামাই মিলেছিল ভাগ্যে।'

সিন্দুর বলল, 'এখন যত দোষ হল বুঝি জামাইয়ের। মানুষ নেই ঘরে, তুমি কোন্ ভরসায় বিয়ের বায়না নিলে শুনি ?'

গগন আবার গর্জে উঠল, 'বোশেখ মাসে ঘর ছেড়ে কোন্ আক্কেলে সে বেরোয় ? তিন চারটে বিয়ের তারিখের কথা খেয়াল নেই তার ?'

মনে মনে স্বামীর ক্রটির কথা অস্বীকার করতে পারে না সিন্দুর। করাতের কাজ ছেড়ে এই সময় চলে আসা সত্যিই তার উচিত ছিল। দলের মধ্যে একমাত্র সানাইওয়ালা ভরতই। পাড়ার আর কেউ সানাই ধরতে জানে না। কেবল ফুঁ দিলেই তো আর সুর ওঠে না সানাইতে। বিদ্যা শিখতে হয়। সে বিদ্যা সবচেয়ে ভালো করে জানে ভরত। দেশভরে ভরতের সানাইএর সুখ্যাতি করে লোকে। এমন ওস্তাদ নেই কাছে ধারে। কতবার কত জায়গা থেকে সানাই বাজিয়ে ভরত মেডেল নিয়ে এসেছে। উজ্জ্বল পালিস করা রূপার মতই চক্‌চক্ করে উঠেছে সিন্দুরের চোখ !

রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞাসা করেছে সিন্দুর, 'কত দাম হবে ?'

ভরত মুখ টিপে হেসেছে, কোন জবাব দেয় নি।

সিন্দুর অধীর হয়ে আবার জিজ্ঞাসা করেছে, 'বল না গো, কত দাম জিনিসটার।'

ভরত তেমনি সহাস্যে জবাব দিয়েছে, 'কত আর, তিনচার টাকা।'

একসঙ্গে তিনচার টাকা খুব কমই হাতে এসে পৌঁছেছে সিন্দুরের। তবু এত গৌরবের জিনিসের দাম এত কম শুনে মুখ ম্লান হয়ে গেছে তার। 'দূর, আমার বিশ্বাস হয় না। তুমি মিছে কথা বলছ। আমি তো ভেবেছি এর দাম তিনচার শো টাকা।'

ভরত হোহো করে হেসে উঠেছে, 'কেবল তিন-চারশো? তিনচার হাজার সিন্দুর, তিনচার হাজার।'

অমন যে চালাক আর মুখরা মেয়ে সিন্দুর সেও স্বামীর দিকে বোবার মত কিছুক্ষণ নিঃশব্দে তাকিয়ে থেকে বলেছে, 'সত্যি তিনচার হাজার। সে ক' কুড়ি টাকা গো।'

ভরত এবার আর হাসে নি, গম্ভীর স্বরে জবাব দিয়েছে, 'অনেক কুড়ি।'

সিন্দুর স্বামীকে অবিশ্বাস করে নি, সসম্ভ্রমে বলেছে, 'তাহলে জিনিসটা কোথায় রাখি বল দেখি। ঝাঁপির মধ্যে? কিন্তু সেটা যে ভাঙা। এত করে বললাম আকাঠার বাক্‌সটা নিয়ে যাও ছুতোর বাড়ি, তালা-চাবির জন্যে আলতারাফ করিয়ে আনো। তা তোমার সব তাতে গাফলেতি।'

ভরত আবার হেসে উঠেছে, 'ঝাঁপিও লাগবে না, বাক্‌সও লাগবে না, সব দামী জিনিসই কি আর বাক্‌স ঝাঁপিতে তালা-চাবি দিয়ে রাখা যায়? তাহলে তো তোকেও রাখতুম।'

সিন্দুর লজ্জিত হয়ে বলেছে, 'আহা!'

ভরত বলেছে, 'বোকা মেয়ে কিছু জ্ঞানগম্যি নেই তোর একেবারে, ওই রূপার চাকতি টুকুর অত দাম হয় বুঝি? তা নয় আসলে দাম হল ওস্তাদের নামের। দাম হল ওস্তাদের মানের। তাকি বাক্‌স-সিন্দুকে থাকে। তার চেয়ে মেডেলখানা ঝুলিয়ে রাখ তোর গলায়, লোকে দেখলেই চিনতে পারবে ভরত সানাইদারের বউ।'

সিন্দুর এবার ঠাট্টাটা বুঝতে পেরেছে স্বামীর, জিনিসটার আসল দামও যেন আন্দাজ করতে পেরেছে খানিকটা। চোখে আর ঠোঁটে হাসির ঝিলিক ছিটিয়ে বলেছে, 'আর মেডেল না ঝুলালে বুঝি কেউ তোমার বউ বলে চিনতে পারবে না।'

ভরত পরম নিঃসংশয়ে জবাব দিয়েছে, 'পারবেই তো না, ভাববে বসন্ত কাঁসীদারের—'

সিন্দুর হাত দিয়ে মুখ চেপে ধরেছে স্বামীর।

জবাব না পেয়ে গগন আবার কি বলতে যাচ্ছিল। মেয়ের অন্যমনস্ক মুখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ একটু যেন থমকে গেল। এতক্ষণ বাদে পশ্চিমের দিকে একটুকরো চাঁদ উঠেছে আকাশে। তার ফিকে আলোয় ভারি নরম আর মধুর দেখাল সিন্দুরের মুখ। কেমন একটু ধক্ করে উঠল গগনের বুকের মধ্যে। দেড় বছরের মা মরা মেয়েকে আট-ন বছর নিজের বুকের ভিতরে রেখে মানুষ করেছে গগন। বিয়ের পরেই চোখের আড়াল হয়ে যাবে সেই ভয়ে খুঁজে-পেতে মা-বাপ মরা ভরতকে এনে ঘরজামাই করে রেখেছে নিজের ভিটার ওপর। তখন থেকেই ভালো সানাই বাজাতে পারত ভরত। গগনের উৎসাহে ভরতের গুণ আরও বেড়েছে, উন্নতি হয়েছে বিগুার। কত বিয়ে আর অন্নপ্রাশনের আসর মাত করে দিয়েছে শ্বশুর-জামাইতে। প্রাণ ভরে প্রশংসা করেছে লোক। ঢোলে যেমন পরিষ্কার হাত গগনের, সানাইতে তেমনি ভরতের গলা। জামাইয়ের গর্বে গগনের বুক ফুলে উঠেছে। দেশ বিদেশে বলে বেড়িয়েছে যোগ্য মেয়ের যোগ্য জামাই পেয়েছে গগন। সেই ভরত,—সেই সাধের জামাই গগনের, কি অদ্ভুত রকমেই না বদলে গেছে আজ। সানাই এখন সে ছুঁতেই চায় না প্রায়। শুকচাঁদ ভুঁইমালীর সঙ্গে গঞ্জে বন্দরে করাত টানাই এখন তার পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে। জামাইয়ের জন্যে সমাজের মানীগুণী পাঁচজনের কাছে মুখ দেখাতে লজ্জা করে গগনের। দুঃখে বুক ফেটে যায়।

একটু চুপ করে থেকে গগন মেয়েকে জিজ্ঞাসা করল, 'কবে ফিরবে কিছু বলে গিয়েছিল ?'

সিন্দুর মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

গগনের আর একবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, 'না! সে কথা বায়না নেওয়ার সময় বললি নি কেন। তখন কেন বললি যে আজও আসতে পারে কালও আসতে পারে।'

কারো ধমক সওয়া সিন্দুরের ধাতে নেই তা সে বাপেরই হোক আর স্বামীরই হোক। গগনের ধমকে সিন্দুরও ঘাড় বাঁকিয়ে রুক্ষস্বরে জবাব দিল, 'আন্দাজ করেছি বলেই বলেছি। কিন্তু তুমিই বা কোন্ আক্কেলে মেয়েমানুষের

একটা আন্দাজী কথার উপর বায়না নিতে গেলে? তখন মনে ছিল না যে এখন দুষতে আসছ আমাকে।'

গগন বলল, 'দুষছি কি কেবল আমি, পাড়া ভরে লোক ছি ছি করছে তোদের ব্যাভারে। ঘরজামাইকে দরকারের সময় ঘরে পাব না এমন কথা শুনেছে নাকি কেউ কোনখানে।'

একটু রাগলেই ঘরজামাই বলে খোঁটা দেওয়া আর ভিটে থেকে ঘর তুলে দেওয়ার ভয় দেখানো অভ্যাস হয়ে গেছে গগনের। ভরতের মুখের সামনে এসব কথা বলতে গগন সাহস পায় না। সিন্দুর যখন একা একা থাকে তখন বলে। ভরতের কানে যে এসব কথা না যায় তা নয় কিন্তু ভরত জবাব দেয়, 'সাক্ষাতে বলুক না দেখি, বুঝব কতখানি বুকের পাটা। আমি যে এ ভিটেয় আছি তা তোর এক বাপের নয় সাত বাপের ভাগ্যি। বুঝিয়ে বলিস বাপকে।'

স্বামীর কথা বাপকে বুঝানো যায় না, বাপের সব কথা বলা যায় না স্বামীকে। মাঝখান থেকে সিন্দুর কেবল কথা শুনে মরে। অবশ্য কেবলই যে শোনে তাই নয়, শোনাতেও ছাড়ে না।

গগনের কথার জবাবে সিন্দুর বলল, 'আহাহা। কত নাখো টাকার সম্পত্তি লিখে দিয়েছ জামাইকে যে রাতদিন ঘরে বসে থাকলেই তার পেট ভরবে।'

গগন বলল, 'তাই বলে কেবল বুঝি করাত টেনে বেড়াবে সে! দু'চারখানা বিয়ের মাসও বাদ দেবে না?'

সিন্দুর বলল, 'কেন বাদ দেবে শুনি? দু'দিন বাঁশী বাজিয়ে খেয়ে মাসের পর মাস উপোস করে মরবার জন্যে? নাতিকে খেয়ে বুঝি আশ মেটে নি এবার জামাইকেও— ?'

বাধা দিয়ে গগন চীৎকার করে উঠল, 'সিন্দুর।'

সিন্দুর বলল, 'তা ছাড়া কি। মনে নেই আকালের বছরের কথা। সাতদিন ধরে উপোস করে পড়েছিলাম। চেয়েও দেখ নি। কচু সেদ্ধ পাতা সেদ্ধ খেয়ে ভেদবমি হয়ে মরল ছেলেটা, ফিরেও তাকাও নি। সাধে তোমার দল ছেড়েছে জামাই? সাধে কি সানাই ছেড়েছে? করাত টানে বেশ করে। দু'পয়সা যাতে আসবে তাই করবে। বয়স থাকলে গা গতর থাকলে তুমিও তাই করতে। পারছ না বলেই হিংসায় ফেটে মরছ।'

মেয়ের কথায় মুহূর্তকাল হতভম্ব হয়ে রইল গগন। তারপর ধরা গলায়

বলল, 'এমন কথা তুই আমাকে বলতে পারলি সিন্দুর। মুখে একবার বাধল না? ছেলে কি তোর একার গেছে? দু'দুটি ছেলেমেয়ে আমার যায় নি? ঘরে ঘরে উপোস করে থাকে নি মানুষ, সোয়ামী-পুত মরে নি আর কারো? কার কি করবার সাধ্য ছিল তখন? কে তাকাতে পারত কার দিকে?'

এতক্ষণ চুপ করেছিল লক্ষ্মী। সিন্দুরের কথায় তার মনেও এবার রাগ আর দুঃখ প্রচণ্ড হয়ে উঠল। বুকের মধ্যে নতুন করে মোচড় দিয়ে উঠল দু'বছর আগেকার ছেলেমেয়ে মরার শোক। অভিমান নয়, এবার সিন্দুরের ওপর দারুণ ঘৃণাই হল লক্ষ্মীর। তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে স্বামীর হাত ধরে এক ঝটকা টান দিয়ে লক্ষ্মী বলল, 'কাকে কি বলছ তুমি। চল ঘরে চল। জন্ম পিশাচের সঙ্গে আবার কথা।'

দাওয়ায় পৈঠার পাশে কানা-ভাঙা একটা কালো মাটির কলসীতে জল এনে রেখেছে লক্ষ্মী। গগন ভালো করে হাত-পা ধুয়ে নিল সেই জলে। তারপর ঘরে গিয়ে খেতে বসল। কাঁসা-পিতলের বাসন-বাটি আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বলে বলে চড়ুইডাঙার হাট থেকে গগনকে দিয়ে একখানা কলাই-করা এনামেলের থালা কিনিয়েছে লক্ষ্মী। রাঁধা-ঢালার কাজ মাটির বাসন-কোসনেই চলে। কিন্তু পোড়া মাটির থালায় করে স্বামীর সামনে ভাত বেড়ে দিতে ভারি দুঃখ লাগে লক্ষ্মীর। মনে পড়ে বাপের বাড়ির সম্পন্ন অবস্থার কথা। ভদ্রলোক বাবুলোকদের মত তার বাপ-খুড়ো মদন ঋষি বদন ঋষি এখনো ঝকঝকে কাঁসার থালায় ভাত খায়। পাইকারকে চামড়ার যোগান দিয়ে তারা অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে। সে কথা উল্লেখ করলে গগন মুখ বাঁকিয়ে বলে, 'তা ফেরাক। তবু তারা চামার। জাত ঢুলী নয় গগন ঢুলীর মত।'

মোটা চালের থালা ভরা ভাত। পাটকেলে রঙের পোড়া মাটির ছোট্ট গামলা থেকে একহাতা ডাল তুলে দিল লক্ষ্মী। তারপর দিল খানিকটা পাটশাক সিদ্ধ।

যাতায়াতে চারক্রোশ পথ হেঁটে এসে অত্যন্ত খিদে পেয়ে গেছে গগনের। পরম পরিতুষ্টির সঙ্গে থাবায় থাবায় গোগ্রাসে সে ভাত গিলতে লাগল। তারপর এক সময় থমকে গিয়ে লক্ষ্মীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'ডাল-তরকারি আছে তো তোর জন্যে? সব দিয়ে ফেললি না তো আমাকে?'

লক্ষ্মী মুখ মুচকে একটু হাসল, 'এতক্ষণ বাদে বুঝি মনে পড়ল সে কথা।

রেখেছি, আমার জন্যেও রেখেছি। ভাবনা নেই তোমার। ওকি সব ভাত মেখে নিলে যে। মাছের তরকারি আছে। বলতে বলতে ডাঁটা আর কুঁচো চিংড়ির তরকারি ভরা ছোট একটা পিতলের বাটি গগনের পাতে উপুড় করে ঢেলে দিল লক্ষ্মী।

গগন খুশি হয়ে বলল, 'আহাহা সব দিলি কেন। মাছ পেলি কোত্থেকে।'

লক্ষ্মী বলল, সিন্দুর আনিয়েছিল বাজার থেকে। রাঁধা তরকারি সে একটু রেখে গেছে তোমার জন্যে।'

গগন হঠাৎ ভাতের থালা থেকে হাত তুলে বসল, 'আর তাই তুই ঢেলে দিলি আমার পাতে? এই তোর আক্কেল হয়েছে নন্দর মা?'

সভয়ে শঙ্কিত মুখে লক্ষ্মী বলল, 'কেন কি হয়েছে তাতে।'

ধমকে উঠে গগন বলল, 'হয়েছে কি তাতে। তুই আমাকে কি ভেবেছিস বল দেখি। বাপ না আমি। মেয়ে হয়ে ওর ছেলে খাওয়ার খোঁটা দিয়েছে না আমাকে? দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের কানে শুনলি না তুই? এর পরও সেই মেয়ের রাঁধা মাছ-তরকারি গলা দিয়ে গলবে আমার? ঘেন্না-পিত্তি নেই আমার শরীরে? মানুষের দেহ না আমার?'

মাথা ভাত ফেলে উঠে দাঁড়াল গগন, বলল, 'আঁচাবার জল দে। হয়ে গেছে আমার খাওয়া।'

লক্ষ্মী অনুনয়ের সুরে বলল, 'মাথা খাও আমার, উঠো না। আমি দোষ করে থাকি আমাকে বকো মারো যা খুশি করো। অন্নলক্ষ্মীর ওপর কিসের রাগ। গেরস্থর অমঙ্গল হয় তাতে, দেশের অমঙ্গল হয়। মনে নেই সে বছরের কথা?'

গগন দ্বিমনা হয়ে পিঁড়ির ওপর ফের বসতে বসতে বলল, 'কিন্তু এ ভাত আমার গলা দিয়ে কিছুতেই নামবে না নন্দর মা। নিতান্তই দিব্যি দিলি তাই বসলাম।'

লক্ষ্মী কোন কথা বলল না। স্বামীর পাতের কাছে চুপ করে বসে রইল। দিব্যি না দিয়ে কি উপায় ছিল তার। বাপ মেয়ের ঝগড়া তো মাসের মধ্যে তিরিশ দিনই লেগে আছে। অকথা কুকথা সিন্দুরের মুখ থেকে কি আজ এই প্রথম বেরুল। সেই রাগে আধপেটা খেয়ে সারারাত মানুষটি বিছানায় এপাশ ওপাশ করুক জেনে শুনে তাই বা লক্ষ্মী সয় কি করে।

খাওয়ার পর আর এক ছিলিম তামাকের ধোঁয়া পেটে যাওয়ায় গগনের

মেজাজটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে এল। হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা খুলে রেখে গগন স্ত্রীকে বলল, 'ঘরে ঝাঁপ এঁটে ছেলে নিয়ে যেমন ঘুমাচ্ছিলি তেমনই আরও খানিকক্ষণ ঘুমো, আমি ঘুরে আসি পাড়া থেকে।'

লক্ষ্মী আপত্তি করে বলল, 'কি করবে পাড়ায় গিয়ে। এত রাতে কে তোমার তরে জেগে বসে আছে শুনি?'

গগন বলল, 'না জেগে থাকে ডেকে জাগিয়ে নেব। কালকের একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। ভালো হোক মন্দ হোক সানাইদার ঠিক করতেই হবে একজন। লোকের কাছে বেল্লিক বনতে পারব না।'

লক্ষ্মী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তার চেয়ে একাজ তুমি ছেড়ে দাও। হাত বান্ধে পা বান্ধে মন বান্ধে কে। একাজে কারো মনই যখন নেই তুমি কেন মিথ্যে সাধাসাধি টানাটানি করে মরছ।'

গগন মনে মনে হাসল। আসলে লক্ষ্মী চায় না যে গগন ঢোল কাঁধে কাঁধে দেশ দেশান্তরে ঘুরে বেড়াক। তার চেয়ে তার বাপ-খুড়োর চামড়ার ব্যবসাকে লক্ষ্মী বেশি মানজনক মনে করে। লক্ষ্মীর সবই ভালো। শান্ত মিষ্টি স্বভাবের মেয়ে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী এবং প্রায় মেয়ের বয়সী হলেও মনে কোন দিন অন্য কোন পুরুষের দিকে চোখ তুলে তাকায় না। সে সব দোষ ছিল সিন্দুরের মার। ভালো রকমই ছিল। কিন্তু লক্ষ্মীর ওসব কিছু নেই। তেল সাবান শাড়ী গয়না নিয়ে দাবি-দাওয়াও নেই মুখে। এ সব দিক থেকে বেশ ভালো মেয়েই বলতে হবে লক্ষ্মীকে। কেবল তার একটা জিনিস পছন্দ হয় না গগনের। বাপের বাড়ির অবস্থা আর মান-মর্যাদা নিয়ে লক্ষ্মীর ভারি দেমাক। স্বামীর পেশাকে, গাঁয়ে গাঁয়ে ঢোল বাজিয়ে বেড়ানোকে লক্ষ্মী খুব হেনস্থা করে। লক্ষ্মী যেন জেনেও জানতে চায় না, বুঝেও বুঝতে চায় না ঢুলী হিসাবে গগনের নামডাক খ্যাতি প্রতিপত্তির কথা। তার সেই যে ধারণা হয়ে গেছে তার বাপের চামড়ার কারবারের চেয়ে আর কোন ভালো কাজ নেই তা লক্ষ্মীর মন থেকে কিছুতেই আর ঘুচাতে পারল না গগন।

কেবল লক্ষ্মীর দোষ দিলেই বা কি হবে পাড়ার লোকের মনোভাব তাই। কারোরই সাধ নেই, সখ নেই, ইচ্ছা নেই দলটাকে ভালো করে গড়ে তোলে, যাতে নামডাক হয় দলের সেই চেষ্টা করে। দলই বা কই। মরে হেজে পাড়া প্রায়ই শূন্য হয়ে গেছে। নিজের বয়সী মানুষ আর চোখে পড়ে না গগনের। ছেলে-ছোকরা যা দু'চারজন আছে অন্য কাজকর্ম করে। নিজের

জামাই ভরতের মতই করাত টানে, কামলা খাটে, কেবল পূজা-পরব, বিয়ে, অন্নপ্রাশনের হিড়িকের সময় এসে ঢোল কাঁধে করে দাঁড়ায়। তাও সব সময় সবাইকে পাওয়া যায় না। সেধে ডেকে খুঁজে-পেতে গগনকেই আনতে হয় তাদের। কিছু বললে জবাব দেয়, 'আরে জ্যাঠা, রেখে দাও তোমার পিত্তি পুরুষের কথা। পেট বাঁচলে তো বাপের নাম।' সে কথা ঠিক। আগের মত পয়সা আর মান-সম্মান নেই এ কাজে। পুজো-পার্বনের সংখ্যা কমেছে। অনেক পূজো গৃহস্থেরা কেবল কাঁসর-ঘণ্টাতেই সারে। খবর দেয় না ঢুলীদের। বিয়ে অন্নপ্রাশনে গেলেও কেবল মজুরীর টাকাটাই মেলে। আগেকার মত পুরোনো কাপড়-চোপড় কি জিনিসপত্র বকশিশ আর কেউ দিতে চায় না। বকশিশ তো ভালো মুড়ি-গুড়ে জলখাবার আর ছু'থালা ভাত ঢুলীদের খেতে দিতে অনেক কর্তা-গিন্নীর মুখ ভার হয়ে ওঠে। কেউ কেউ বায়নার সময়েই চুক্তি করে যায়, না, জলখাবারের ব্যবস্থা হবে না। তার চেয়ে বরং মাথা প্রতি ছ'পয়সা ছু'আনা হারে পয়সা ধরে নাও। বায়না-পত্রও কমেছে। আগে যেখানে চার ঢোল ছ' ঢোল না হলে বিয়েই হত না এখন সেসব জায়গায় বায়না আসে মাত্র ছু' ঢোল এক কাঁসি এক সানাইয়ের। তবু কুড়িয়ে-বাড়িয়ে এই কটি জিনিসই যোগাড় করা ভার হয়ে পড়ে গগনের। ঢোল মেলে তো সানাই মেলে না, সানাইদার জোটে তো ঢুলী একজন কম পড়ে। কেবল কি তাই। এই সব ছেলে-ছোকরাদের সঙ্গে বাজিয়ে মোটে সুখ পায় না গগন। কারোরই হাত পরিষ্কার নয়। মুহূর্তে মুহূর্তে তাল কাটে। সকাল সন্ধ্যায় বছরে ছু'চার দিনও যদি তালিম না দেয় তাল ঠিক থাকবে কি করে। রাগে গা জ্বলে যায় গগনের, বুক জ্বলে যায়। বকে ধমকে সবাইকে একশেষ করে। সঙ্গীদের বেতালা বাজনায় সমস্ত ছুনিয়াটাকেই তাল কাটা বলেই মনে হয় গগনের।

তবু যেমন করেই হোক ওদেরই ভিতর থেকে কাউকে দিয়ে সানাইদারের কাজটা কাল চালিয়ে নিতে হবে। মোহন ঢুলীর ছেলে নিতাই নাকি পারে এক-আধটু ফুঁ দিতে। তাকে গিয়ে এখনই বলে রাখা দরকার।

লক্ষ্মীকে ঘরে গিয়ে ঘুমোতে বলে গগন নিতাইদের বাড়ির পথ ধরল।

লক্ষ্মী পিছন থেকে ডেকে বলল, 'অন্ধকারে কেন যাচ্ছ অমন করে। দাঁড়াও লণ্ঠনটা জেলে দিই। গরমের দিন। পথ-ঘাট ভালো নয়। রাত করে

নাম করতে নেই, মা মনসার চেলারা বাইরে বাইরেই থাকে। দোহাই তোমার লণ্ঠনটা নিয়ে যাও।'

গগন ধমক দিয়ে উঠল, 'থাম থাম, আদিখ্যেতা তোর রাখ নন্দর মা। এ বাড়ি থেকে ও বাড়ি যাব তার আবার লণ্ঠন। কত কষ্টে যোগাড় করেছি এক বোতল কেরোসিন। তা পুড়িয়ে সাবাড় না করা পর্যন্ত বুঝি আর নিশ্চিন্ত হতে পারছিস না?'

তারপর স্ত্রীর অভিমান ক্ষুব্ধ মুখের দিকে চেয়ে গলার স্বরটাকে নরম করে গগন বলল, 'কিছু ভয় নেই তোর যা শুয়ে থাক গিয়ে। চুলে একটু একটু পাক ধরেছে বলে ভেবেছিস বুঝি চোখের জ্যোতিও আমার ধরে এসেছে। তা নয়। এখনো বেশ ঠাহর পাই। চিনতে মোটেই ভুল হয় না। পথ চিনতেও না, মানুষ চিনতেও না।'

লক্ষ্মী মুখ টিপে একটু হাসল। সে তো কোনদিন বলে না যে গগন বুড়ো হয়ে পড়েছে। বা সে জন্য তেমন হায় আফসোসও কোনদিন প্রকাশ করে না লক্ষ্মী। তবু নিজেকে একটু কমবয়সী বলে প্রমাণ করতে অমন সব অদ্ভুত চেষ্টা করে কেন গগন। জোয়ান মানুষকে কি তার মুখ ফুটে বলতে হয় সে জোয়ান। তার মুখ দেখলেই তা বোঝা যায়।

উঠান থেকে পথে নেমে গগনের মনে হয় লণ্ঠনটা ধরিয়ে আনলেও নিতান্ত মন্দ ছিল না। বাঁশ ঝাড়ে আর আগাছার জঙ্গলে মাথার ওপরকার আকাশ কি পায়ের তলার মাটি কিছু চোখে পড়ে না। অমাবস্যার কাছাকাছি তিথি। অন্ধকারটা ভারি ঘনই হয়েছে এখানে। হঠাৎ আর একজন লোকের প্রায় গায়ের ওপর গিয়ে পড়ল গগন। সামলে নিতে নিতে রুক্ষ স্বরে গগন প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'কে।'

'আমি কেশব।'

গগন ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'ও কেশব! দেখেশুনে পথ চলতে পারিস নে? মাধব দাসের আখড়া থেকে গাঁজা টেনে ফিরলি বুঝি?'

গগনের ধমকে কিন্তু কেশব মোটেই ভড়কাল না। তরল কণ্ঠে হেসে উঠে বলল, 'মাথা ঘুরে গায়ের ওপর এসে পড়লে তুমি, আর গাঁজা খাওয়ার বদনাম দিচ্ছ আমাকে। এত রাতে যাচ্ছ কোথায় শুনি?'

গগন বলল, 'যাচ্ছিলাম তো নিতাইর কাছে। সে কি বাড়ি এসেছে না কি আখড়ায় বসে এখনো গাঁজা টানছে, সত্যি করে বল দেখি।'

কেশব বিস্মিত হয়ে বলল, 'সে কি, তুমি কোন খবর রাখ না দেখছি ঢুলীর পো। কোথায় ছিলে এতক্ষণ।'

গগন বলল, 'ধূল গাঁ গিয়েছিলাম সানাইদারের খোঁজে। সেখানে পেলাম না সনাতনকে। কিন্তু নিতাইর কথা কি বলছিস তুই। তাকে তো দুপুরের পরেও দেখা গেছে বাড়িতে।'

কেশব বলল, 'তা তো দেখা গেছে। কিন্তু এক ছিলিম গাঁজা ট্যাঁকে গুঁজে সন্ধ্যার পর সে যে চড়ুইডাঙা রওনা হয়ে গেল।'

গগন বলল, 'চড়ুইডাঙা কেন। সেখানে কি।'

কেশব বলল, 'ভুলে গেলে নাকি সব? সেখানে তার শ্বশুরবাড়ি না? সেখান থেকে খবর নিয়ে এসেছিল তার ছোট শালা। বার কয়েক দাস্ত বমি হয়ে বউ নাকি নিতাইর যায় যায়। তবু আখড়ার লোভ ছেড়ে নিতাই যেতে চায় না। ঠেলে ঠুলে আমিই পাঠিয়ে দিলাম জোর করে।'

গগন কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে নিঃশব্দে ফিরে এল। অন্ধকারে হতাশ ক্ষীণ কণ্ঠ শোনা গেল একটু, 'তবে আর গিয়ে কি হবে।'

কেশব এল পিছনে পিছনে, আগের মতই তরল স্বরে বলল, 'ব্যাপার কি, হল কি তোমার। নিতাইর বউয়ের অসুখের খবরে তুমি অমন করে মিইয়ে পড়লে কেন ঢুলী খুড়ো।'

গগন বিরক্ত হয়ে বলল, 'ইয়ারকি দিসনে কেশব। তোর বাপের বয়সী বয়স না আমার।'

কেশব বলল, 'আহাহা তাতো বটেই। কিন্তু ব্যাপারটা কি আমাকে ঠিক করে বল দেখি।'

শেষের দিকে গলার স্বরে তরল পরিহাসের বদলে বেশ একটু আন্তরিকতা ফুটে উঠল কেশবের। বাঁশের ঝোপ থেকে খোলা পরিষ্কার জায়গায় দুজনে ততক্ষণ বেরিয়ে এসেছে। মাথার ওপরে জ্বলজ্বল করছে তারা ভরা আকাশ। গগন ফিরে দাঁড়াল। আবছা আলোয় পরস্পরের দিকে তাকাল দুজনে।

গগন বলল, 'চণ্ডীপুর সরকার বাড়ি বিয়ের বায়না আছে কালকে। দুই ঢোল, এক কাড়া, কাঁসি আর সানাই। ভরত এসে পৌঁছাল না জানিস তো, নিতাইও গেল শ্বশুরবাড়ি। সানাই ধরবার আর লোক নেই পাড়ায়। আমি এখন কি উপায় করি বলতো।'

কেশব বলল, 'আমাকে নাও না। অমন দু'এক বিয়ের সানাই আমিও তো দিয়ে আসতে পারি বাজিয়ে।'

গগন আবার চটে উঠে বলল, 'ফের তুই আমার সঙ্গে ঠাট্টা শুরু করলি কেশব ?'

কেশব বলল, 'ঠাট্টা করব কেন ঢুলী খুড়ো, সত্যি বলছি। তুমি তো জানো এক ভরত ছাড়া তোমাদের ঢুলী পাড়ার কারো চেয়ে সানাই আমি খারাপ বাজাই নে। সেবার স্কুলের মাঠে সানাইয়ের পাল্লা দিয়েছিলাম মনে আছে ?'

গগন বলল, 'আছে। কিন্তু সে তো বাজিয়েছিলি সখ করে,আহ্লাদ করে। এতো আর সে রকমের বাজনা নয়। আমাদের দলের সঙ্গে অন্য গাঁয়ের বিয়ে বাড়িতে বাজাতে হবে। ভুঁইমালীর ছেলে তুই। সেরকম অন্যায় অনুরোধ তোকে কেন করতে যাব।'

কিন্তু কেশবের মনের ভিতরে উল্লাস যেন উপচে পড়ছে। ফের তরল কণ্ঠে জবাব দিল কেশব, 'রেখে দাও তোমার ন্যায় অন্যায়। নিতাই ঢুলীর ঘরে পান্তাভাত খেয়ে খেয়ে জাতজন্ম কিছু বাকি আছে নাকি যে ভুঁইমালী ভুঁইমালী করছ। যদি বল তো সঙ্গে যেতে পারি। দেখবে কি রকম সানাই একখানা বাজাই।'

কথাটা নিতান্ত অসম্ভব লাগল না গগনের। কেশব ভুঁইমালীর ছেলেই বটে। কিন্তু মা-বাপও নেই নিকট-আত্মীয় বলতেও কেউ নেই। স্বভাব প্রকৃতিও নিতান্তই বাউণ্ডুলে গোছের। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়স হতে চলল কিন্তু নির্দিষ্ট কোন কাজকর্মে তার মন এল না। সেবার এক যাত্রার দলের সঙ্গে চলে গিয়েছিল। চেহারা সুন্দর বলে ভারি পছন্দ হয়েছিল অধিকারীর। কিন্তু সেখানেও বেশিদিন টিকতে পারে নি। ফিরে এসেছে গাঁয়ে। এ বাড়ি ও বাড়ি ফাই-ফরমাস খাটে, খোরাকটিও সেবেলার মত জোটে সেখানে। সন্ধ্যার পর গিয়ে জোটে মাধব বৈরাগীর আখড়ায়। সেখানে গাঁজা টানে, তার ভিক্ষার চালে ভাগ বসায়। পাড়ার নিতাই ঢুলীর সঙ্গে বন্ধুত্ব ছেলেবেলা থেকে। যেদিন অন্য কোথাও জোটে না সেদিন যায় তার বাড়ি। ভুঁইমালীরা সবাই দূর দূর করে। যেদিন মাধব বৈরাগী আর নিতাইও তাড়া দেয় সেদিন ফের গাঁ থেকে উধাও হয় কেশব। জাত-জন্ম বাছ-বিচার সত্যিই তার কিছু নেই। গুণের মধ্যে কেবল একটা গুণ তার আছে। বাঁশী আর সানাই মোটামুটি সে ভালোই বাজায়।

খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে গগন বলল, 'কিন্তু তোর কথায় বিশ্বাস কি। গাঁজার ঘোরে তুই এখন যা বলছিস একটু পরেই তো তা ভুলে যাবি।'

কেশব বলল, 'কিচ্ছু ভুলব না ঢুলী খুড়ো। তুমি মোটেই ভেব না। দু' ছিলিমের দামটা কেবল দাও আমাকে, দেখবে সব মনে থাকবে আমার।'

গগন ভেবে দেখল। কেশব গাঁজা খায়, নিজের খেয়াল মত চলে কিন্তু কথা দিলে তার বড় একটা নড়চড় করে না। দেখাই যাক না। ওকে দিয়ে কাজটা যদি কোন রকমে চালিয়ে নেওয়া যায় মন্দ কি। কথা যদি কেশব রাখে ভালোই নাহলে উপস্থিত মত কোন একটা ব্যবস্থা তো করতেই হবে। সানাইদার নেই বলে বিয়ের বায়না তো আর নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।

ঠিক হল রাত থাকতে থাকতে উঠে কেশব গিয়ে খালপারের বটতলার ঘাটে গগনের জন্য অপেক্ষা করবে। দলের সঙ্গে না যাওয়াই তার ভালো। ভুঁইমালীদের কেউ দেখে ফেললে হয়তো কিছু বলতে পারে। অবশ্য কেশব কি করল না করল, খেল না খেল তা নিয়ে মাথা ঘামায় না। কেশবও কারো কোন তোয়াক্কা রাখে না। নিজের জাতের চেয়ে অন্য জাতের লোকের সঙ্গেই তার খাতির আর মেলামেশা বেশি। তার মধ্যে উত্তর পাড়ার ব্রাহ্মণ কায়েতরা আছে, মধ্যপাড়ার কুণ্ডু চৌধুরীরা আছে, আর আছে এ পাড়ার ঢুলীরা। ঢুলীদের সঙ্গেই যে কেশবের সব চেয়ে বেশি ঘনিষ্ঠতা, গোপনে গোপনে এদের হাতে ভাতও যে সে খায় তা তারাও জানে। কিন্তু তা নিয়ে আগু বাড়িয়ে কেউ কোন কথা বলতে যায় না, পাছে খাওয়ার সময় কেশব তাদের কারো বাড়িতে গিয়ে হাজির হয়।

কথাবার্তা সব ঠিক করে বাড়ি ফিরে এল গগন। ছেলে নিয়ে লক্ষ্মী পড়ে পড়ে একপাশে ঘুমাতে লাগল কিন্তু রাতভর গগন কেবলই এপাশ ওপাশ করল। কিছুতেই ঘুম আর হল না ভালো করে। বহুদিন বাদে দল-বল নিয়ে চণ্ডীপুরের সরকার বাড়িতে বাজাতে যাওয়ার সুযোগ যখন এল দেখা গেল গগনের দলও নেই বলও নেই। এক সময় এই পাড়াতেই তিন-তিনটে ঢুলীর দল ছিল। চব্বিশ ঘণ্টা প্রায় শোনা যেত ঢোলের শব্দ। বিয়ে অন্নপ্রাশনের বড় বড় বায়না এলে তিন দিন আগে থেকে সমানে তালিম দেওয়া হত দলের

লোকদের। এসব গগনের ছেলেবেলার কথা। বড় হয়ে নিজে দল গড়ল গগন। সে দল কতবার ভেঙেছে কতবার ফের গড়ে উঠেছে কিন্তু এবারকার মত এমন করে কোনদিনই দল একেবারে নষ্ট হয়ে যায় নি। পাড়ায় পাড়ায় গাঁয়ে গাঁয়ে মানুষ হাতড়ে বেড়াতে হয় নি ঢোল আর সানাই ধরবার জন্য। দিন কাল একেবারেই বদলে গেছে। এমন যে আদরের ঘরজামাই ভরত তাকেও দরকারের সময় কাছে পাওয়া যায় না। এর চেয়ে আফসোসের আর কি আছে গগনের।

তখনো বেশ রাত আছে খানিকটা। গগন মেয়ের ঘরের ঝাঁপের কাছে এসে দাঁড়াল। সানাইটা চেয়ে নিয়ে রাখতে হবে আগেই।

'সিন্দুর, ও সিন্দুর, একটু ওঠ দেখি মা।'

গগনের গলার স্বর বেশ নরম, মিষ্টি মিষ্টি।

দু' তিন ডাকের পর ঘুম ভাঙল সিন্দুরের। কিছুক্ষণ কান খাড়া করে থেকে বলল, 'কি বলছ।'

গগন বলল, 'ওঠ এবার। রাত আর বেশি নেই।'

সিন্দুর বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি করব উঠে।'

গগন একটু চুপ করে থেকে বলল, 'উঠে তোদের সানাইটা একবার দিবি, বায়না তো রাখতেই হবে। সঙ্গে করে নিয়ে যাই জিনিসটা, তারপর কাউকে দিয়ে যেমন তেমন করে চালিয়ে নেব কাজ।'

কেশবের কথাটা আগেই ভাঙল না গগন। দরকার কি।

সিন্দুর শুয়ে শুয়েই ঘরের ভিতর থেকে জবাব দিল। বলল, 'কিন্তু ও সানাই তো আমি দিতে পারব না।'

গগন অবাক হয়ে বলল, 'পারবি না! কেন।'

সিন্দুর বলল, 'তোমার জামাইর নিষেধ আছে। তার হাতের জিনিস তার মত না নিয়ে কাউকে দিতে পারব না আমি।'

গগন বলল, 'কিন্তু সেবারও তো দিলি।'

সিন্দুর বলল, 'ইচ্ছা হল দিলাম। তাই বলে বার বারই দিতে হবে এমনই বা কি দায়ে পড়েছি।'

মনের মধ্যে রাগ উত্তাল হয়ে উঠল গগনের। ইচ্ছা করতে লাগল ঝাঁপ ভেঙে অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ, একগুঁয়ে মুখরা মেয়েটাকে চুলের মুঠি ধরে এখনই টেনে নিয়ে আসে বাইরে। কিন্তু বহু কষ্টে মনের রাগ মনেই চেপে রাখল

গগন। সিন্দুর যে রকম মেয়ে তাতে ওভাবে কোন ফল হবে না। খুন করে ফেললেও ওর জিনিস অমন করে আদায় করা যাবে না এমনই জেদী মেয়ে সিন্দুর। হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ে গেল গগনের। ভারি টাকার লোভ মেয়েটার। সেবার সানাই নিয়ে কিছুই ওকে দেওয়া হয় নি। বোধ হয় সেই আখেজ আছে মনে। সেইজন্যই ছাড়তে চাইছে না। কথাটা মনে হতেই ভারি দুঃখ হল গগনের, খচ করে উঠল বুকের ভিতরে। অল্প বয়সে মা-মরা একমাত্র মেয়ে। নিজের হাতে কোলে-পিঠে করে মানুষ করা। মনে পড়ল কোথাও বাজাতে বেরবার সময় সিন্দুরকে কারো কাছে রেখে যাওয়াই দায় হয়ে পড়ত। কিছুতেই তার কাছ ছাড়া হতে চাইত না সিন্দুর। অনেক ভুলিয়ে-টুলিয়ে খেলনা আর খাবার হাতে দিয়ে তাকে পাশের বাড়ির হরিদাসের বৌয়ের কাছে রেখে যেত। তারপর দলের সঙ্গে ঢোল কাঁধে ক্রোশের পর ক্রোশ হাঁটতে থাকত গগন। মাঠ পার হত নদী পার হত খেয়ায় কিন্তু মেয়ের কাছেই পড়ে থাকত মন। বাড়ি এলে ছোট ছোট দুখানি হাত দিয়ে সিন্দুর তার গলা জড়িয়ে ধরত, ঠোঁট ফুলিয়ে বলত, 'আর তো ফেলে যাবে না আমাকে? নিয়ে যাবে সঙ্গে?'

নেয় কি করে। ছেলে তো নয় মেয়ে। দলের লোকের ঠাট্টার ভয়ে সিন্দুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারত না গগন কিন্তু বাড়িতে যতক্ষণ থাকত কাছে কাছেই সে রাখত মেয়েকে। পাঁঠার চামড়ার ছাউনী লাগাত ঢোলে। সিন্দুর তার পাশে বসে চেয়ে চেয়ে দেখত। বেতের ধামা বাঁধত, সাজি বাঁধত গগন, সিন্দুর বসে থাকত এক নিরিখে। ছ' সাত বছর বয়স থেকে দেখে দেখে সেও ধামা-সাজি বাঁধতে শিখল, শিখল বাঁশের কাজ। পাড়ার সবাই বলত, 'মেয়ে বটে তোমার একখানা গগন। ছেলে হলে এর দাম হত লাখ টাকা।'

গগন বলত, 'কি জানি কি হত। আমার সিন্দুরের দাম কিন্তু লাখ টাকার চেয়ে ঢের বেশি।'

সেই সিন্দুর একেবারে পর হয়ে গেছে। বাপ বলে গ্রাহ্যই করে না গগনকে। ভালো-মন্দ সুখ-দুঃখ বুঝতে চায় না বাপের। কেবল বোঝে নিজের সুখ নিজের স্বার্থ। আম নিয়ে জাম নিয়ে ডাল-পাতার ভাগ নিয়ে লক্ষ্মী আর তার ছেলে-মেয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে। কুটোগাছটিও সে ছাড়তে চায় না। গগন যে বুড়ো হয়েছে, তার যে অভাবের সংসার সে সম্বন্ধে একটুও মায়া-দয়া নেই তার। পয়সা ছাড়া কিছু চেনে না সিন্দুর।

গগন একবার ভাবল কাজ নেই ওর সানাই নিয়ে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল এটি কোনও কাজের কথা নয়। সানাই খুঁজতে যাবে আবার কোথায়। পাড়ায় আর দ্বিতীয় সানাই নেই। একটু চুপ করে থেকে গগন আবার অনুনয় বিনয় শুরু করল, 'অমন অবুঝের মত করিস নে সিন্দুর, ওঠ। সানাই ছাড়া কি করে বায়না রাখতে যাব বল দেখি। উঠে আমাকে দে সানাইটা। কথা দিচ্ছি ফিরে এলে একটা টাকা তোকে আমি দেব।'

সিন্দুর যেন আরও জ্বলে উঠল, 'ঈস, আবার টাকার লোভ দেখানো হচ্ছে। খুব টাকাওয়ালা মানুষ হয়ে গেছ বুঝি আজকাল। কাল রাত্রে যে গালাগালগুলো দিলে ভেবেছ টাকায় তা বুঝি ধুয়ে যাবে, না ?'

ঝাঁপ খুলে সিন্দুর এবার সানাইটা এনে হাতে দিল গগনের। বলল, 'দেখ, জিনিসের যেন কোন ক্ষেতি না হয় আমার। যে মানুষ, তাহলে কিন্তু আর রক্ষা থাকবে না।'

গগন বলল, 'না না কিছু ভয় নেই তোর।'

কিন্তু মনে মনে ভাবল আদিখ্যেতা দেখ মেয়েটার। আর একজন কেউ একটু বাজালে যেন ক্ষয়ে যাবে ওদের সানাই। ক্ষমতায় মেজাজে তার স্বামীর পৌরুষ যে অনেক বেশি ঘরজামাই হলেও সে যে শ্বশুরের চেয়ে বড় এই মিথ্যা বড়াইটা গগনের কাছে না করলেই যেন চলে না সিন্দুরের। গগন মনে মনে একটু হাসল। এখনও তার ঢের দেরি। করাত টেনে বেশি টাকাই রোজগার করুক আর যাই করুক মানে মর্যাদায় এ গাঁয়ে গগনকে ছাড়িয়ে যেতে আরেকবার জন্মাতে হবে ভরতকে, এ জন্মে কুলোবে না।

ভোর ভোর সময় যাত্রার আয়োজন শুরু হল। পাড়া থেকে ঢোল কাঁধে করে এল যাদব আর রামলাল। বার-তের বছরের ছোকরা নিমাই এল সঙ্গে। কাঁসি বাজাবে সে। এরই মধ্যে বেশ তাল-তেহাই জ্ঞান হয়েছে ছোঁড়ার। বেশ পরিষ্কার হাত।

অনেককালের পুরোনো তাফি লাগানো কালো রঙের হাতা কাটা কোটটা পরে নিল গগন। খুঁজে-পেতে একটা কৌটার ভিতর থেকে দু'খানা রুপোর মেডেল বের করে লক্ষ্মী স্বামীর হাতে এনে দিল। বাসি বিয়ের দিন ভোরে মলা বাজাবার সময় গগন মেডেল দু'খানা পকেটের কাছে গুঁজে নিতে পারবে। যাদব আর রামলালও যথাসাধ্য সেজেগুজে এসেছে। চৌধুরী বাড়ি থেকে সেবার একটা পুরোনো পাঞ্জাবি পেয়েছিল যাদব। একটু বড় বড় হয় গায়ে।

কাঁধের কাছে একটু ছেঁড়াও আছে। তবু সেই ছেঁড়া জায়গাটা একটু গুঁজে দিয়ে আস্তেন দুটি গুটিয়ে জামাটাকে যাদব বেশ মানানসই করে নিয়েছে। রামলালের অবস্থাটা আরও কিছু ভাল। নিজেরই ছিটের শার্ট আছে তার। দিব্যি মানিয়েছে গায়ে। উৎসাহে প্রত্যেকের মুখ জলজল করছে।

তাদের দিকে তাকিয়ে চোখ তৃপ্ত হয়ে গেল গগনের। মনটা আনন্দে ভরে উঠল। আগেকার দিন আর নেই। তখনকার মত বড় দলও আর নেই। দু' চারজন ছেলে-ছোকরাকে নিয়েই আজ বেরুতে হচ্ছে। তবু তো দল একেবারে ভেঙে যায় নি। তবু তো নিজের জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর ছেলেদের নিয়েই আজ বাজাতে যেতে পারছে গগন। যতই বেয়াড়া বদমাস হোক, অন্য কাজকর্ম করে বেড়াক গগনের ডাকে তবু তো সবাই ঢোল কাঁধে এসে জুটেছে। আর অন্যসময় যে যাই করে বেড়াক না কেন সবাইকেই তো এখন জাত ঢুলী বলে মনে হচ্ছে। হাসিখুশিতে ভরে উঠেছে তো সবারই মুখ।

উঠান থেকে পথে নামবার সময় গগনের নির্দেশ মত সবাই একটু কাঠি দিল ঢোলে। নিজেদের কানেই আওয়াজটা ভারি মধুর লাগল।

উঠানের পূব প্রান্তে বিচে-কলার গাছ হয়েছে দু' তিনটে। ছেলে কোলে নিয়ে লক্ষ্মী এসে দাঁড়াল সেখানে। একটু দেরি করে এল সিন্দুর। মাঠের আল বেয়ে গগনের ছোট দল তখন বেশ খানিকটা এগিয়ে গেছে। সিন্দুরকে দেখে লক্ষ্মী কোন কথা বলল না। কিন্তু সিন্দুরই এবার এগিয়ে এসে একহাতে গলা জড়িয়ে ধরল লক্ষ্মীর, বলল, 'মানুষটির সত্যই কোন আক্কেল হল না রে।'

লক্ষ্মী বলল, 'কোন্ মানুষটার? তোর বাবার?'

সিন্দুর একটু হাসল, 'না রে না বাবার জামাইর কথা বলছি।'

কিন্তু মুখের হাসি সত্ত্বেও চোখটা যেন একটু ছলছল করে উঠল সিন্দুরের। গলাটা মনে হল ধরা ধরা।

বিয়ের বায়না সেরে দল নিয়ে গগন ঢুলী ফিরে আসবার আগেই কথাটা পাড়ায় পাড়ায় জানাজানি হয়ে গেল। জামাইয়ের বদলে ভুঁইমালীদের কেশবকে নিয়ে গেছে গগন। সানাইদারের কাজ তাকে দিয়েই সারবে। বর-কনের বিয়ের মুকুট পৌঁছে দিতে গিয়েছিল মুকুন্দ মালাকার। পথে সে নিজের চোখে দেখে এসেছে কেশবকে। ঢুলীর দলের সঙ্গে মিশে সানাই হাতে কেশব যাচ্ছে চণ্ডীপুরের দিকে।

ঢুলী পাড়ার দক্ষিণে দশ-বার ঘর ভুঁইমালীর বাস আছে। ফুলবাগ গাঁয়ে। কথাটা শুনে তারা সবাই অপমানিত বোধ করল। এতবড় স্পর্ধা হয়েছে ঢুলীদের যে ভুঁইমালীর ছেলের জাত মারতে চায় তারা। গাঁজাখোর মাথায় ছিটওয়ালা কেশবটারই না হয় কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই, জাতজন্ম বিচার নেই, বোধ নেই মান-অপমানের; কিন্তু গগন ঢুলীর আক্কেলখানা কি। মরবার বয়স হতে চলল আর এ হিসেবটা তার হল না। কোন্ বুদ্ধিতে সে নিয়ে গেল অন্য জাতের ছেলেকে আড়ালে আবডালে নয়, নিস্তব্ধ রাত্রে পাড়াপড়শীর ঘরের বারান্দায় নয়, একেবারে প্রকাশ্যভাবে ভিন্নগায়ে ভিন্ন জাতের দলে বিয়ের মত বৃহৎ সামাজিক ব্যাপারে যে সানাই বাজাবার জন্যে গগন তাকে টেনে নিয়ে গেল একবার সে ভেবে দেখল না তার পরিণামটা কি। না কি সে ভেবেছে ভুঁইমালীরা একেবারে মরে গেছে, জাতসুদ্ধ উজাড় হয়ে গেছে তারা গাঁ থেকে।

পাড়ার মধ্যে মোড়ল জলধর। ষাটের কাছাকাছি বয়স। মাথার চুলে পাক ধরলেও এখনও বেশ শক্ত-সমর্থ চেহারা; ঘরের ভিত্ আর শ্রাদ্ধের বেদী বাঁধায় এক সময় বেশ নাম-ডাক ছিল জলধরের। যেমনি তাড়াতাড়ি চলত তার কোদাল তেমনি সুন্দর আর মজবুত হত হাতের কাজ। আজকাল অবশ্য কোদাল সে প্রায় ধরেই না। কেবল ভিটে বাড়ির মালিক চৌধুরীরা যদি কোন ক্রিয়া-কার্যে ডাকেন তাহলে যায়। মাটির ভিতের তো আর তাঁদের দরকার নেই, দোতালা পাকা বাড়ি উঠেছে তাঁদের, কেবল শ্রাদ্ধশান্তির সময় গিয়ে খোঁজ-খবর নিতে হয় জলধরকে কাজকর্মের দরকার আছে কিনা। মাঠে বিঘা পাঁচেক জমি আছে জলধরের। চাষআবাদ ছেলেরাই করে। দেখাশোনা খবরদারীর ভার শুধু জলধরের ওপর।

মুকুন্দ মালাকরের কাছে জলধর নিজেই এল ভাল করে কথাটা শুনতে। দাওয়ায় বসে মুকুন্দ বিড়ি বাঁধছিল। জলধরকে দেখে জলচৌকিখানা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'এস মালী জ্যেঠা এস। তারপর খবর কি বল দেখি।'

জলধর একটু ভ্রূকুটি করল। প্রায় ছেলের বয়সী বয়স মুকুন্দের। কিন্তু ঐ বয়সী স্বজাতের ছেলেরা যেমন 'আসুন বসুন' বলে সম্মান সমীহ দেখায় জলধরকে, মুকুন্দের কাছ থেকে ঠিক সেইরকম শ্রদ্ধা জলধর কোনদিন পায় না। ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ছেলে-ছোকরারা যে ধরনে কথাবার্তা বলে, যে রকম সম্বোধন করে মুকুন্দও ঠিক সেই রকম করতে চায় জলধরের সঙ্গে। যেন কায়েত পাড়ার কাছে বাড়ি বলে মুকুন্দ নিজেও কায়স্থদের পর্যায়ে উঠেছে। অবশ্য

জাত হিসাবে ফুলমালী মালাকরেরা ভুঁইমালীদের চেয়ে দু'এক ধাপ ওপরেই। সমাজে বসে না খেলেও ইদানীং হাতের জল প্রায় ভুঁইমালীদেরও চল হয়ে গেছে। বাড়ি-টাড়িতে এলে ব্রাহ্মণ-কায়স্থদের ছেলেরা জলধরের বউ-ঝি কি নাতি-নাতনীদের হাতের জল খেতে আজকাল কোন আপত্তি করে না। কিন্তু মুকুন্দরা প্রকাশ্যভাবেই এ গাঁয়ে জল চল হয়েছে একপুরুষ আগে মুকুন্দের বাবা যুধিষ্ঠির মালাকরের সময় থেকে।

যুধিষ্ঠির প্রায় সমবয়সী ছিল জলধরের। বিয়েতে অন্নপ্রাশনে সোলার মুকুট তৈরি করত। মাটি দিয়ে যে শ্রাদ্ধের বেদী গড়ে তুলত জলধর নানা আকারের নানা রঙের সোলার ফুল দিয়ে সেই বেদী সাজাবার ভার ছিল যুধিষ্ঠিরের। পূজায় পার্বণে হাতের তৈরি সোলার ফুল দিয়ে যেত সে বাড়িতে বাড়িতে। গাছের হাজার ফুল থাকলেও মালীর সোলার ফুল না পাওয়া পর্যন্ত পূজা হত না গৃহস্থের। পূজার পর বাড়ি বাড়ি ঘুরে যুধিষ্ঠির পার্বণী আদায় করত। ঘরের সব চেয়ে বড় ধামাটি নিত সঙ্গে। মুড়ি-মুড়কি নারকেল নাড়ুতে ভরে আনত সেই ধামা। তখন থেকেই জাত হিসাবে প্রতিবেশী ভুঁইমালীদের চেয়ে সে যে উঁচুতে এমন একটা স্পষ্ট ধারণা ছিল যুধিষ্ঠিরের মনে। গাঁয়ে ব্রাহ্মণ-কায়স্থরাও তার সেই ধারণার সমর্থন করত। তবু মুকুন্দের মত এতখানি অহঙ্কার কোনদিন ছিল না যুধিষ্ঠিরের। জলধরের বাপখুড়োকে সে সমীহ করত, বন্ধুর মত ব্যবহার করত জলধরের সঙ্গে। কিন্তু গাঁয়ের এম-ই স্কুলে দু'এক বছর পড়ে আর উঁচু জাতের সঙ্গে একটু বেশী মেলামেশা করে মুকুন্দর চাল-চলন আচার-ব্যবহারটাও হয়েছে কিছু চড়া চড়া গোছের। ভুঁইমালীদের সে স্পষ্টই ছোটজাত বলে মনে করে। কথাবার্তা আলাপ-ব্যবহারও করে যেন খানিকটা উঁচু জায়গা থেকে। কিন্তু দেমাকের মত অবস্থাটা চড়ে যায় নি মুকুন্দের বরং যুধিষ্ঠিরের তুলনায় পড়েই গেছে। যুধিষ্ঠিরের মত তেমন চমৎকার মুকুট আর ফুল তৈরি করতে পারে না মুকুন্দ। তার কাজের চাহিদাও আর ঠিক তখনকার দিনের মত নেই। বিয়ের জন্যে বর-কনের মুকুটের চাহিদাটা এখনও আছে কিন্তু শ্রাদ্ধের বেদী সাজানো কিংবা পূজায় পার্বণে মালীর তৈরি ফুল নেওয়ার রেওয়াজটা ক্রমেই উঠে যাচ্ছে। পূজাপার্বণের সংখ্যাও গেছে কমে। ছেলেবেলায় বাপের সঙ্গে সঙ্গে ধামা মাথায় নিয়ে ঘুরত মুকুন্দ কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি হওয়ার পর ধামা নিয়ে বেরুনো সে বন্ধ করেছে। একবার একটি চাকর রেখেছিল ধামা বইবার জন্যে কিন্তু লোকে

ঠাট্টাতামাসা করায় তাকে ছাড়িয়ে দিতে হয়েছে। খরচেও পোষায় নি তাছাড়া। বিয়ের পাঁচ-ছয় বছরের মধ্যে কোন ছেলেপুলে হয় নি মুকুন্দের। হবে না বলেই সকলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু বছর দেড়েক হল জন্মেছে একটি বাচ্চা। ধামা বইবার বয়স তার হয় নি, আর মুকুন্দের ছেলে ধামা কোনদিন বইবেও না। মুকুন্দের স্ত্রী রতি বলে বিশু বড় হয়ে বি, এ,-এম, এ, পাস করে চাকরি করবে গিয়ে শহরে। সোলার ফুল তৈরি করবার কাজ কোনদিন সে করবে না। পৈতৃক পেশা মুকুন্দ নিজেও অনেকবার ছেড়ে দেবে ভেবেছে, আংশিকভাবে ছেড়ে দিয়েওছে কিন্তু তার বদলে ভালরকম টাকা-পয়সা আসে তেমন কোন কাজে স্থায়ী এবং পাকাপাকিভাবে হাত দিতে পারে নি। তেল-নুন মসলাপাতির দোকান দিয়েছিল একবার গাঁয়ের বাজারে। তাতে লোকসান দিয়ে কিছুকাল হল বিড়ি বাঁধতে শুরু করেছে। এতেও যে তেমন কিছু সুবিধা হচ্ছে বাড়ি-ঘর আসবাব-পত্রের চেহারা দেখে তা মনে হয় না। বরং ভুঁইমালীরা দরকার হলে কোদালের বদলে কুড়ুল করাত ধরে, বর্গা চষে, ধান-পাট কাটে কিন্তু তাদের সঙ্গে মিশে মুকুন্দ মালাকরের সে সব করবার জো নেই। একটু মিহি ধরনের কাজ না হলে মান বাঁচে না মুকুন্দের।

বিড়ির গোড়ায় সবুজ সুতোর গিঁট দিয়ে বাড়তি অংশটুকু কাঁচিতে কেটে ফেলে জলধরের দিকে মুখ তুলে তাকাল মুকুন্দ। তারপর আর একবার জিজ্ঞাসা করল, 'খবর কি জ্যেঠা! নাও, বিড়ি নাও একটা। খেয়ে দেখ দেখি কড়া হয়েছে কি না।'

বড় একটা ডালার ওপর মুখ-পোড়া বিড়ি ছোট ছোট বাণ্ডিলে বাঁধা ছিল। তার থেকে একটা বিড়ি তুলে নিয়ে জলধরের হাতে দিল মুকুন্দ তারপর ঘরের আধা ভেজানো দরজার দিকে তাকিয়ে স্ত্রীর উদ্দেশ্যে ডাক দিয়ে বলল, 'দেশলাইটা ফেলে দাও তো এখানে।'

ফেলে দিতে বললেই অবশ্য দিয়াশলাইটা ছুঁড়ে ফেলে দিল না রতি। দরজার আড়াল থেকে হাত বাড়িয়ে দিয়াশলাইএর বাক্সটা জলধরের প্রায় সামনে দাওয়ার মেঝের উপর আস্তে রেখে দিল। নীলরঙের কাঁচের চুড়ি আর শাঁখা পরা নিটোল পরিপুষ্ট শ্যামবর্ণের একখানি হাত। জলধর আর মুকুন্দ দুজনেই সেই হাতের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে পরস্পরের মুখের দিকে তাকাল। কাঠি জ্বেলে বিড়ি ধরিয়ে জলধর জিজ্ঞাসা করল, 'ছেলে কই মুকুন্দ? ঘুমুচ্ছে বুঝি।'

মুকুন্দ মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ। এই বয়সটাই সুখের জ্যেঠা। খাওয়া আর ঘুমনো ছাড়া আর কোন দায় নেই সংসারে।'

জলধর সংক্ষেপে বলল, 'তা ঠিক।' তারপর শিশু বয়সের সুবিধা সুযোগের আলোচনা ছেড়ে ধাঁ করে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে বসল, 'আমাদের কেশবকে নাকি তুমি গগন ঢুলীর দলের সঙ্গে যেতে দেখে এসেছ মুকুন্দ।'

মুকুন্দ আড়চোখে একবার জলধরের মুখের দিকে তাকাল, তারপর বলল, 'দেখলাম তো তাই।'

জলধর জিজ্ঞাসা করল, 'হাতে নাকি সানাই ছিল তার?'

মুকুন্দ বলল, 'হ্যাঁ, সানাই একটাও দেখলাম তার হাতে।'

জলধর বলল, 'শুধু দেখলেই? কিছু বললে না? গগন ঢুলীকে কি কেশবকে একবার জিজ্ঞাসাও করলে না সে কেন যাচ্ছে ওই সঙ্গে?'

উত্তেজনার আভাস পাওয়া গেল জলধরের গলায়।

মুকুন্দ মুচকি হেসে বলল, 'জিজ্ঞাসা করলে ওরা ভারি চক্ষুলজ্জায় পড়ত জ্যেঠা। সত্যকথা পট করে বলতেও পারত না গোপনও রাখতে পারত না আমার কাছে। মুখে ওরা কিছু না বললেও বুঝতে তো কিছু আমার আর বাকি থাকত না। তার চেয়ে দেখি নি দেখি নি করে আমিও পাশ কাটিয়ে এলাম ওরাও পাশ কাটিয়ে ডান দিক দিয়ে সরে গেল। সেই ভাল হয়েছে।'

এবার ধৈর্যচ্যুতি ঘটল জলধরের, একটু বেশি মাত্রায়ই চড়ে গেল গলাটা, কর্কশ কটুকণ্ঠে জলধর বলে উঠল, 'কিন্তু বাপের বেটা যে, আর বুকের পাটা যার আছে সে অমন পাশ কাটিয়ে আসে না মুকুন্দ। অনাচার অত্যাচার দেখলে রুখে দাঁড়ায়, দু'চার কথা বলে কয়ে একটা বিধি-বিহিত করে তবে ফেরে।'

শান্ত বিবেচক ধরনের মানুষ মুকুন্দ। ধৈর্যশীল বলে খ্যাতি আছে তার। সহসা মাথা গরম আর মুখ খারাপ করে বসে না সে। দত্ত বাড়ির এম, এ, পাস করা সুবিমল তার আদর্শ। ছুটি-ছাটায় কলকাতা থেকে যখনই সে বাড়ি আসে মুকুন্দ গিয়ে বসে তার কাছে, আলাপ করে—কথাবার্তা বলে। সুবিমলও বেশ পছন্দ করে মুকুন্দকে। পাশে বসিয়ে তাসের সঙ্গী পর্যন্ত করে নিতে কোন সঙ্কোচ করে না। তাকে দেখে শিখেছে মুকুন্দ। ভিতরে ভিতরে রেগে আগুন হলেও দাঁত মুখ না খিঁচনোটাই যে ভদ্রতা এ বোধ মুকুন্দর হয়েছে সুবিমলের আচার-ব্যবহার লক্ষ্য করে। হেসে হেসে কড়া কথা শুনিয়ে দিতে

পারলে শ্রোতার জ্বালাটা যে আরও বেশিই হয় এও মুকুন্দ বহুবার বহু জায়গায় পরখ করে দেখেছে।

জলধরের কথা শুনে সুবিমলের কায়দায় মুখের হাসিটুকুকে অবশ্য ঠিক অটুট রাখতে পারল না মুকুন্দ, কিন্তু তাই বলে মুখ চোখ বিকৃত হতেও দিল না। নিরুত্তেজ শান্ত স্বরেই বলল, 'এর আবার একটা বিধি-বিহিতের কি আছে জ্যেঠা। তাছাড়া আমি বিধি-বিহিত করতে গেলে তা শুনতই বা কে। তোমাদের ভিতর থেকে কেউ হত তা হলেও না হয় কথা ছিল। তাছাড়া জাত যে কেশব কেবল আজি দিল তাও তো নয়।'

মুকুন্দ এবার একটু হাসল, 'বলতে গেলে ঢুলীপাড়ার ভাত খেয়েই তো ও মানুষ। চিরদিনই তো ও তোমাদের জাতে ঠেলা, পায়ে ঠেলা। ধরতে গেলে সমাজের বাইরের মানুষ। কেশব ভুঁইমালী সানাই-ই ধরুক আর ঢোলই ধরুক ফুলবাগের ভুঁইমালীদের যে তাতে মান যাবে সত্যি বলছি জ্যেঠা তা আমার মনেই হয় নি। মনে হলে নিশ্চয়ই দু'কথা বলতাম গগনকে। তোমার মত অতখানি বুকের পাটা না থাকলেও এক আধবার রুখেও দাঁড়াতাম, দু' একটা কানমলাও অন্তত দিয়ে আসতাম কেশবকে।'

মনে মনে ভারি আত্মপ্রসাদ বোধ করল মুকুন্দ। ঠাণ্ডা মেজাজে ঠিক সুবিমলবাবুর মতই বলতে পেরেছে কথাগুলো, আর অবিলম্বে ফল ফলেছে তার। রাগে আর উত্তেজনায় ছটফট করে উঠেছে বুড়ো জলধর ভুঁইমালী।

জলচৌকি ছেড়ে তড়াক করে সত্যিই লাফিয়ে উঠল জলধর। বলল, 'থাক, থাক্ কেশবকে কানমলা দেওয়ার মত আরও লোক আছে ভুঁইমালীপাড়ায়। তার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। জলধর ভুঁইমালী এখনও বেঁচে আছে। সে স্বজাতের ছেলে-ছোকরার বাঁদরামির শাসন করতে জানে আবার ভিন্ন জাতের লোকের অবিচার অপমানের শোধ নিতেও কোনদিন ভয় করে না।'

উঁচু দাওয়া থেকে নামবার জন্যে খেজুরে পৈঠা আছে গোটা তিনেক। কিন্তু সেই পৈঠা বেয়ে নামবার মত সবুর সইল না জলধরের। দাওয়া থেকেই লম্বা পা বাড়িয়ে দিল উঠানের ওপর। কিনারের খানিকটা ভেঙে পড়ল নিচে। জলধর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হনহন করে মুকুন্দর উঠান পার হয়ে নামল গিয়ে রাস্তায়। হতবাক্ হয়ে তার দিকে একটু তাকিয়ে ছিল মুকুন্দ। স্ত্রীর হাসির শব্দে চমকে উঠে ফিরে তাকাল, বলল, 'হাসছ যে।'

রতি বলল, 'হাসব না? রাগের মাথায় বুড়ো আমার ডোয়া ভেঙে দিয়ে

গেল যে। ছুটে ধর গিয়ে শিগগির। তোমারই বা অত কুঁজড়ো বুদ্ধি কেন বাপু। কুমড়োর বিচির মত পেটভরা অত খোঁচা মারা কথা কিসের জন্যে। হয়ে গেছে দেশলাইর কাজ? নেব?'

'দাঁড়াও।'

কাঠি জ্বেলে নিজে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে দিয়াশলাইটা স্ত্রীকে ফেরত দিল মুকুন্দ। হাতের পাতায় হলদে ছোপ লেগেছে রতির। বোধহয় বাটনা বাটতে বাটতে উঠে এসেছে। রতি বলল, 'না, দাঁড়ানোয় কাজ নেই, এবার যাই। এখানে দাঁড়ালেই তো বসে বসে তুমি কেবল মুখ চালাবে। হাতের কাজ আর চলবে না। এতখানি বেলার মধ্যে ক'শো বিড়ি বাঁধা হল শুনি?'

মুকুন্দ বলল, 'মনিব নাকি তুমি আমার যে হিসাব নিচ্ছ কাজের?'

রতি বলল, 'মনিব ছাড়া কি। তুই থেকে তুমি বলতে শুরু করেছ। এখন যে-আজ্ঞা আর 'আপনি' ধরলেই হল।'

কথাটা রতি আরও কয়েকদিন বলেছে মুকুন্দকে। স্বামীর মুখে সব সময় 'তুমি তুমি' যেন ভারি পোষাকী পোষাকী লাগে। কেমন যেন পর পর মনে হয় স্বামীকে। কখনও বা নিজেকেই ঠেকে পরস্ত্রীর মত। কিন্তু মুকুন্দ তা বলে মত বদলায় নি। পাড়ার ভদ্রঘরের স্ত্রী-পুরুষের পরস্পরের সম্বোধন সে লক্ষ্য করে শুনেছে। দত্তবাড়ি, বোসেদের বাড়ি কি বাঁড়ুয্যে বাড়িতে কেউ স্ত্রীকে তুই বলে না। রাগের সময়ও নয়। সোহাগের সময়ও নয়। সঙ্গে সঙ্গে নিজের অভ্যাসটাও পালটে নিয়েছে মুকুন্দ। আর আশ্চর্য দখল তার নিজের জিভের ওপর। স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবার সময় আজকাল ভুলেও একবার তুমি ছাড়া তুই আসে না তার মুখে। প্রথম প্রথম রতি তো হেসেই অস্থির।

'ও কি গো, তুমি তুমি করছ কেন। পরের বউ বলে ধরে নিলে নাকি আমাকে।'

মুকুন্দ ঈষৎ শাসনের সুরে বলেছে, 'ছিঃ, ওসব কি বিশ্রী কথা। পরের বউ ভাবতে যাব কেন। নিজের বউকেই ভদ্রলোক তুমি বলে ডাকে।'

রতি বলেছে, 'তা ডাকুক গিয়ে। আমার কিন্তু তুই কথাটাই মিষ্টি লাগে ভারি। ঘরে তো আর পাঁচজন শ্বশুর-শাশুড়ী জা-ননদ নেই। মিষ্টি করে ডাকতে অত লাজ কিসের তোমার।'

আরও একদিন রতি তাকে সাবধান করে দিয়েছে, 'দেখ দিনের বেলায়

ডাকতে হয় ডেকো, কিন্তু রাত্রেও তুমি আমাকে অমন আর তুমি তুমি করো না। তোমার মুখে তুমি শুনলে একসঙ্গে থাকার আনন্দই যেন মাটি হয়ে যায়।'

অমনিতে ভারি শান্ত আর ঠাণ্ডা মানুষ মুকুন্দ। কিন্তু কিছুতেই গোঁ ছাড়বে না নিজের। রতিই হাল ছেড়ে দিয়েছে শেষ পর্যন্ত। বলুক যা বলে খুশি হয়। পৃথিবী আনন্দময় যার চিত্তে যা লয়।

স্ত্রীর কথায় জবাবে মুকুন্দ বলল, 'তা আপনিই বলি আর যে-আজ্ঞাই বলি বিড়ি কয়েক শো বেশি করে বাঁধলে কিছুতেই তোমার বোধহয় আপত্তি নেই। আসলে ধরণ ধারণটা নিতান্ত মনিবের মতই তোমার।'

রতি মুখ টিপে একটু হাসল, বলল, 'বেশ, তাহলে হুকুমটাও শোন মনিবের। গল্প না করে কাজ কর। আজ হাটবার তা মনে আছে!'

প্রত্যেক হাটবারে রতনগঞ্জে ভুবন সা'র দোকানে গিয়ে বিড়ি জমা দেয় মুকুন্দ। নগদ পয়সা যা মেলে, হাটের খরচটা তাতেই প্রায় কুলিয়ে যায়। কিন্তু কিছুদিন ধরে বিড়ি বাঁধার কাজে যে ঢিল দিচ্ছে মুকুন্দ তা রতির দৃষ্টি এড়ায় নি। ষাট, সোনার চাঁদ ছেলে এসেছে ঘরে এখন কি আর অমন কুঁড়ে হলে চলে মুকুন্দকে। এখন তো কেবল আর দুজনের খাওয়া-পরাই নয়, আর একজনের ভবিষ্যতের কথাও ভাবতে হবে যে। দুহাতে টাকা রোজগার না করলে সেই ভবিষ্যৎ গড়ে উঠবে কি করে?

রতি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'বলি কথা বলছ না যে! আছে তো মনে?'

মুকুন্দ এবার একটু বিরক্ত হয়ে উঠল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। আছে আছে।'

রতি ঠোঁট টিপে হাসল, 'না থেকে আর উপায় কি কর্তা। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে ঘরের মধ্যে জলজ্যান্ত একটা বউ যখন আছে বেঁচে। আচ্ছা, আমি মরলেই তুমি শান্তি পাও, তাই না?'

মুকুন্দ আরও খানিকটা বিরক্ত হয়ে বলল, 'খুব খুব। তাতে কি আর সন্দেহ আছে কোন?'

গলার স্বর রীতিমত ঝাঁঝাল আর চড়া হয়ে গেছে মুকুন্দের। ওরে বাব্বা! আর নয়, ঠাণ্ডা মানুষ হঠাৎ রেগে গেলে না করতে পারে হেন কাজ নেই। রতি তাড়াতাড়ি উঠে গেল ঘরের মধ্যে, কিন্তু রান্নাঘরে যাওয়ার জন্যে খিড়কিদোরের চৌকাঠ পেরুতে না পেরুতেই পুবদিকের মাঠের ভিতর থেকে ঢুম ঢুম ঢোলের শব্দ কানে এল তার। রান্নাঘরে ঢোকা আর হল না। কৌতূহলী

হয়ে ফের ফিরে এল রতি স্বামীর কাছে। একটুও মনে রইল না, যে আজ হাটবার—কাছে গেলে বিড়ি বাঁধার ব্যাঘাত হবে মুকুন্দের।

ঘরের ভিতর দিয়ে ফের আবার দাওয়ায় নামল রতি, স্বামীকে জিজ্ঞাসা করল, 'শুনছ ?'

মুকুন্দ বলল, 'কি বলছ বল না।'

রতি হেসে বলল, 'পোড়া ছাই। আমি যা বলি তাতো রাত দিনই শোন। সে কথা বলছি না। বলি ঢোলের শব্দ শুনতে পেলে না মাঠের দিক থেকে ?'

কোনরকম ঔৎসুক্য না দেখিয়ে মুকুন্দ বলল, 'শুনলাম তো।'

নিস্পৃহতা লক্ষ্য না করে উল্লসিত কণ্ঠে রতি বলে উঠল, 'দলবল নিয়ে গগন ঢুলীই ফিরে এল বোধহয়। কেশবও নিশ্চয়ই আছে ওই সঙ্গে ?'

মুকুন্দ বলল, 'থাকবে না যাবে কোথায়।'

কিন্তু কৌতুক কৌতূহল আর একধরনের উত্তেজনায় রতি ততক্ষণে রীতিমত চঞ্চল হয়ে উঠেছে। স্বামীর নিরুত্তাপ ধরণটাকে একটুও আমল না দিয়ে রতি বলল, 'খুব তো লম্ফঝম্ফ করে গেল তোমাদের ভুঁইমালী বুড়ো। শেষে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড বাধাবে না তো ?'

বিড়ির গোড়ায় সুতোর গিঁট দিতে দিতে মুকুন্দ বলল, 'রক্তারক্তি না ঘোড়ার ডিম। যাও রাঁধো গিয়ে।'

আচ্ছা মানুষ মুকুন্দ। খানিক আগে রতি তাকে কাজের তাগিদ দিয়েছে বলে বুঝি এমনি করে তার শোধ নিতে হবে। মনে মনে ভারি রাগ হল রতির। যেতে যেতে বলল, 'যা বললে তাই কিন্তু রাঁধব। তাই খেয়েই থেকো সারাদিন।'

মুকুন্দের স্ত্রী রতির অনুমান মিথ্যে নয়। পূব দিকের মাঠের সরু আল পথ বেয়ে গগন ঢুলীর দলই এগিয়ে আসছিল গ্রামের দিকে। ডাইনে বাঁয়ে জমিতে পাট বুনিয়েছে কিষাণরা। সবুজ কচি পাটের চারা বাতাসে নড়ছে একটু একটু। কেউ কেউ গামছা কাঁধে কাঁচি নিয়ে নিড়াতে বসেছে জমিতে। এপাশে ওপাশে জমি। মাঝখান দিয়ে আধ হাত চওড়া আল। কোন কোন জায়গায় আধ হাতেরও কম। পাশাপাশি যাওয়া যায় না। আগে পিছে হাঁটতে হয়।

গাঁয়ের কাছাকাছি এসে হঠাৎ ঢোলে বারকয়েক কাঠি দিয়ে উঠল রামলাল। দলের মধ্যে রামের বয়সই সব চেয়ে কম। বিয়ে বাড়িতে কাঁসি

বাজিয়েছে। কিন্তু পথে নেমে জোর করে কেড়ে নিয়েছে যাদবের ঢোল। বলেছে, 'বাজাব না, কাঁধে করে কেবল বয়ে নিয়ে যাব। তাতে তোমার অত আপত্তি কিসের যাদবদা।'

গগন ছিল সবচেয়ে পিছনে। রামলালের ঢোলের বাজনা শুনে সেখান থেকেই ধমক দিয়ে উঠল, 'ওকি, দুপুর বেলায় ফের ট্যাং ট্যাং শুরু করলি কেন রামা। তাল জ্ঞান নেই, মান জ্ঞান নেই কাঠি দিলেই কেবল হল বুঝি ঢোলে।'

রামলাল নিচু গলায় গজ গজ করতে করতে বলল, 'আচ্ছা মুশকিলেই পড়া গেছে বুড়োর জ্বালায়। তাল মান জ্ঞান না থাকলে কাঁসি বাজিয়েছি কি করে। পথে ঘাটে নেমেও বুঝি একটু বেতালা বাজাতে সাধ-আহ্লাদ হয় না মানুষের। চিরকাল কেবল বুঝি তালে বাজাতেই ভাল লাগে?'

যাদব আর কেশব ছিল পিছনে। রামলালের নালিশের ভঙ্গি দেখে হেসে উঠল। গগন বলল, 'কি হল রে। অত হেসে মরছিস কেন। খুব যে ফুর্তি দেখছি কেশবের।'

যাদব বলল, 'ফুর্তি হবে না কেন জ্যেঠা। একধার থেকে লোকে যদি অমন পঞ্চমুখে সুখ্যাতি করে ফুর্তি কোন্ মানুষের না হয় শুনি। ফুর্তির চোটে পথের মধ্যে যে চৌচির হয়ে ফেটে পড়ে নি কেশব তাই রক্ষা।'

যাদবের কথার ভঙ্গিতে কেশবও হাসল, বলল, 'ফেটেছি কি না ফেটেছি না দেখেই অমন ফস করে বলে দিস না যাদব। গায়ে হাত বুলিয়ে আগে ভাল করে দেখে নে। পথের মধ্যে একেবারে ফেটে না পড়লেও বুকে পিঠে দু'চার জায়গায় ফাটল কি আর না পড়েছে।'

কিন্তু মুখে যত তামাসাই করুক সত্যি সত্যিই স্ফূর্তির জোয়ার এসেছিল কেশবের মনে। কনের মাসী পুরোনো পুরোনো একখানা শাড়ি বকশিশ দিয়েছিল বাদ্যকারের দলকে। ফিকে হয়ে গেলেও শাড়িখানির গোলাপী রঙটুকু একেবারে মুছে যায় নি। পথে নেমে পাগড়ির মত করে কেশব মাথায় জড়িয়ে নিয়েছিল সেই শাড়িখানা। বলেছিল, 'রোদ লাগছে যাদবদা।'

যাদব কানের কাছে মুখ নিয়ে বলেছিল, 'কেন মিছে বলছিস। রোদ তো আমাদের সবারই লাগছে। তাই বলে মাথায় তোর মত অমন পাগড়ি বেঁধেছি কে। রোদ নয়, তোর রঙ লেগেছে কেশব, মাথায় নয় চোখে।'

কথাটা ঠিকই, রঙ কিছু কিছু চোখে মনে লেগেছিল কেশবের। বাঁশী বাজিয়ে যে এমন সুখ, এমন আনন্দ পাওয়া যায় তা যেন সে এই প্রথম অনুভব

করল। এর আগেও নিরালায় গভীর রাত্রে সে বাঁশী বাজিয়েছে, সানাই নয়, বাঁশের বাঁশী। মাধব বৈরাগী আর তার বোষ্টমী তুলসী কোনদিন কান পেতে শুনেছে, কোনদিন বা বিরক্তি প্রকাশ করে বলেছে, 'আ, থাম্ কেশব, থাম্ হয়েছে, এবার ঘুমুতে যা, কোনদিন বা উঠে গেছে কোনদিন বাজিয়ে বাজিয়ে তাদের আরও বিরক্তি করে তুলেছে। কিন্তু এমন প্রকাশ্যে বিয়ে বাড়িতে সানাই বাজিয়ে লোকের প্রশংসা পাওয়া তার ভাগ্যে আর হয় নি। এ আনন্দের স্বাদ আলাদা। গোপনে গোপনে নিজের মনে মনে খুশি হওয়া না আরও পাঁচজনের মনে খুশি ছড়িয়ে দিতে দিতে নিজেরও খুশি হয়ে ওঠা।

সরকারদের মেজকর্তা গগনকে বলেছিলেন, 'তোমার জামাই ভরত আসে নি শুনে ভারি রাগ হয়েছিল। ভেবেছিলাম দলের মধ্যে অমন সানাই ধরবার আর লোক কোথায় তোমার। কিন্তু এ ছেলেটিও তো দেখলাম বেশ বাজায়। ভরতের চেয়ে নেহাত যে খারাপ বাজিয়েছে তা নয়। কালে কালে বোধহয় ভরতকে ছাড়িয়ে যাবে। ধরে রেখো, যেন অন্যদলে না চলে যায়।'

গগন মৃদু হেসে বলেছিল, 'আজ্ঞে না কর্তা, অন্য কোন দলে যাবে না। কিন্তু আমার দলেও ওকে ধরে রাখতে পারব না তাই বলে। ও আমাদের জাতের লোক নয় কর্তা, ঢুলী নয় ও। ভুঁইমালী, সখ করে বাজাতে এসেছে।'

মেজকর্তা কেশবের দিকে কৌতূহলী চোখে তাকিয়ে বলেছিলেন, 'বল কি হে ভারি আশ্চর্য তো, ভুঁইমালীর ছেলে না কি ও। কোদাল ছেড়ে সানাই নিয়েছে কেন হাতে। এ আবার কি সখ। জাত যাবে যে। কিন্তু যাই বল বাজিয়েছে কিন্তু বেশ।'

ছোটকর্তা দেশ-গাঁয়ে থাকেন না। চাকরি করেন কলকাতায়। কালেভদ্রে আসেন বাড়িতে। গগনকে ছেলেবেলায় দু'একবার দেখেছেন। সেই সূত্রে আলাপও করলেন গগনের সঙ্গে, বললেন, 'এই বুঝি তোমার সেই সানাইদার জামাই? বেশ বাজায় তো। সেজদির বিয়েতেও তো তোমরা সেবার এসেছিলে।'

যাদব আর রামলাল কেশবের দিকে তাকিয়ে মুখ মুচকে হাসতে লাগল। লজ্জিত হয়ে অন্য দিকে চোখ ফিরিয়ে নিল কেশব। গগন জিভ কেটে বলল, 'আজ্ঞে না কর্তা, আমার জামাই নয়, ওর নাম কেশব, অন্য বাড়ির লোক। ক'দিন ধরে ভারি জ্বর হয়েছে ভরতের। তাই সে আসতে পারল না।'

ইচ্ছা করেই একটু মিথ্যা কথা বলল গগন। ভুঁইমালীদের শুকচাঁদের

সঙ্গে গগনের মত নামকরা ঢুলীর জামাই করাতের কাজে বেরিয়েছে বিদেশে বিভূঁয়ে এসে একথা স্বীকার করা যায়? তাতে গগন ঢুলীর মত লোকের মান থাকে?

ছোটকর্তা অপ্রতিভ হয়ে পড়েন, কৌতুক পেয়ে একটু হাসলেন ও মুখ চেপে তারপর বললেন, 'ও তাই বল, আমারই ভুল হয়েছে তাহলে চিনে উঠতে পারি নি। কিছু মনে করো না।'

গগন সবিনয়ে হাত জোড় করেছিল, 'আজ্ঞে না কর্তা, মনে করবার আবার কি আছে। আপনি কি গাঁয়ে থাকেন না আসেন যে মানুষ চিনবেন এখানকার।'

কেবল সরকার বাড়ির কর্তারাই নয়, বিয়ে বাড়িতে আরও যত কুটুম্ব-স্বজন এসেছিল, পাড়া-পড়শী যারা এসেছিল বিয়ে দেখতে তারা সবাইই যে কেশবের সানাই শুনে খুশি হয়েছে এ সম্বন্ধে তার মনে কোন সন্দেহ ছিল না, বরযাত্রীর আসরে যখন কনের মুখ দেখানো হল সেই চন্দনের দাগ লাগা হাসি হাসি মুখ কেশবও দূর থেকে লক্ষ্য করেছিল। তার সানাই নিশ্চয়ই শুনেছে এই বিয়ের কনে। মুখ ফুটে তো বলে যেতে পারে নি কেশবকে। লজ্জায় বেধেছে কিন্তু সুরটুকু নিশ্চয়ই ভাল লেগেছে তার। দেখে শুনে বেশ ভাল জামাই এনেছেন, জিনিসপত্র গয়না-গাঁটিও খুব দিয়েছেন। খুশি হবার যথেষ্টই কারণ আছে বিয়ের কনের, কিন্তু কেশব প্রাণমন দিয়ে সানাই বাজিয়েছে, বিয়ের কনের মনের সুর ফুটিয়ে তুলেছে তার বাঁশীতে তার জন্যেও কি একটু বেশী খুশি হয় নি বিয়ের আসরের ওই রাঙা চেলী পরা মেয়েটি? পরদিন বাসি বিয়েব পর বিকালের দিকে যখন বর-কনের বিদায় নেওয়ার পালা এল ছলছল করে উঠল মা জ্যেঠীর চোখ, জল দেখা দিল কনের কাজল-পরা চোখে তখনও ঠিক মানানসই সুর বেজেছিল কেশবের সানাইতে। বাজাতে বাজাতে নিজের চোখেই একসময় জল এসে পড়েছিল কেশবের, তার সানাই যদি যোগ না দিত; যদি ঠিক ঠিক সুর না ধরত সেই সময়, মা জ্যেঠীর সঙ্গে সঙ্গে তার সানাইও যদি অমন করে কেঁদে না উঠত, তাহলে কি আশেপাশে দাঁড়ানো পাড়া-পড়শী কুটুম্ব-স্বজনের চোখ-মুখ অত ভার ভার দেখাত, অতখানি দুঃখ লাগত তাদের সবারই মনে?

কেশবের ধারণা তার সানাইতে সবাই খুশি হয়েছিল, যারা মুখ ফুঁটে বলে গেছে কেবল তারাই নয়, যারা মুখ ফুটে বলে যেতে পারে নি তাদের আনন্দও

তাদের চোখে মুখে দেখতে পেয়েছিল কেশব। দলের যাদব আর রামলালও খুব প্রশংসা করেছিল, 'বেশ বাজনা হচ্ছে কেশব, বেশ বেশ। তোর সানাই শুনে কে বলবে তুই ঢুলী নয় জাতে।'

কেশব হেসে বলেছিল, 'দূর দূর, ঢুলী আবার একটা জাত নাকি? ঢুলী কেন হতে যাব আমি, আমরা ভুঁইমালী। তোদের চেয়ে দু তিনটি উঁচু ধাপের মানুষ। জানিস হাতের জল প্রায় চল্ হয়ে এসেছে আমাদের।'

বড়াই যে নিজে করে নি কেশব, জাতের মোড়ল শ্রেণীর লোকের অনুকরণ করে তাদের ঠাট্টা করেছিল, কেশবের আবার জাত-জন্মের বালাই আছে নাকি? নিতাই ঢুলীর বাড়িতে ফেন-পান্তা খেয়ে খেয়ে উদ্ধার হয়ে গেছে না, উদ্ধার করে দিয়েছে না চোদ্দ পুরুষ।

তবু যখন ঢুলীদের খাবার ডাক এল, সরকারদের পুবের দাওয়ায় কলার পাতা পেতে বসতে বসতে গগন ঢুলী গম্ভীর মুখে তার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'তুই কি আমাদের সঙ্গেই খাবি কেশব না একটু আগে পরে বসবি, না কি কর্তাদের বলব তোকে আলাদা জায়গায় ঠাঁই করে দিতে?'

সানাই থামলেও সানাইএর সুর থামে নি কেশবের মনে। যাদবের ঠিক ডান পাশটিতে বসে, মেটে গ্লাসের জলে পাতা ধুয়ে নিতে নিতে কেশব জবাব দিয়েছিল, 'হ্যাঁ, কর্তাদের বলে এস গগনখুড়ো, আমাকে একেবারে বামুন কায়েতের বৈঠকে নিয়ে বসিয়ে দিয়ে আসুক, সানাই বাজাবার বেলায় কানাই আর খাওয়ার বেলায় দূর দূর করছ।'

গগন তেমনি গম্ভীর স্বরে বলেছিল, 'দেখ বাপু, শেষ কালে যেন এই নিয়ে একটা গণ্ডগোল-টোল কিছু না হয়।'

কেশব হেসে বলে ছিল, 'হ্যাঁ গণ্ডগোল কেন, একেবারে যুদ্ধ বেধে যাবে ইংরেজ জার্মানে।'

গগনের মনের ভাবটা একটু একটু না বুঝতে পেরেছিল কেশব তা নয়। যদিও গগন এর মধ্যে দু'চারবার বলেছে, 'বায়নাটা তোর জন্যই এবার রয়ে গেল কেশব, জাতের ভয় না করে আমার জাত-মান তুই বাঁচালি, নিজের ছেলে জামাইতেও এতখানি করে না, কিংবা তোর যে সত্যিই এতখানি সুর-মান জ্ঞান আছে তা আমি ভাবি নি কেশব, সত্যিই বেশ হচ্ছে তোর সানাই, বেশ হচ্ছে তোর সানাই, বেশ বাজাচ্ছিস্।'

এ সব কথাও মাঝে মাঝে তাকে গগন শুনিয়েছে, তবু কেশবের

সুখ্যাতিতে প্রাণ খুলে যে গগন সায় দিতে পারছে না তা কেশব টের পেয়েছিল। বুড়োর ভাব দেখে মনে মনে কেশব না হেসে পারে নি। যে প্রশংসাটা তার জামাই ভরতের পাওয়ার কথা সেই প্রশংসা পাবে কেশব। সহ্য করতে পারবে কেন গগন? হলই বা জামাইয়ের সঙ্গে তার অবনিবনা ও মন কষাকষি, তবু জামাই তো সম্পর্কে, সিন্দুরকে তো সে সুখে রেখেছে, ভাত-কাপড় দিচ্ছে। তার পাওনাটা কেশব যদি নিতে যায় মনে মনে রাগ তো একটু হতেই পারে গগনের, তাছাড়া কেশবকে তার জামাই বলে লোকে বার বার ভুল করায়ও বুড়ো গগন মনে মনে কম চটে নি। মনে মনে ভারি কৌতুক বোধ করেছে কেশব। এই ব্যাপারে মুখে বলেছে, 'এ কিন্তু ভারি অন্যায় কর্তাদের। দেশ গাঁয়ে থাকবেন না, লোকজন চিনবেন না রামকে বলবেন শ্যাম আর শ্যামকে বললেন যদু। গগন বলেছে, 'হুঁ'।'

'কিন্তু রামকে শ্যাম বললেই তো সে আর শ্যাম হয়ে যায় না, কি বল ঢুলীখুড়ো।'

গগন ঢুলী বিরক্ত হয়ে বলেছে, 'আঃ, এবার থাম দেখি কেশব, একটু ঘুমুতে দে। গাঁজার ঘোরেই তুই থাকিস ভাল, না পেলেই বকবকানি বাড়ে।'

বিদায় বকশিশ নিয়ে দলের সঙ্গে গাঁয়ের দিকে এগুতে এগুতে বিয়ে বাড়ির কথাই বার বার মনে পড়েছিল কেশবের। আর যাদব তার ভাব-ভঙ্গি দেখে কথাবার্তা শুনে মাঝে মাঝে ফোড়ন কাটছিল। গগনের কাছ থেকে যতখানি প্রাণখোলা কৃতজ্ঞতা, আর প্রশংসা কেশব আশা করেছিল ততখানি না পেলেও আনন্দের অভাব ছিল না কেশবের মনে। এর আগে দু'কান ভরে নিজের এমন সুখ্যাতিও যে কোনদিন শোনে নি কোন উঁচু জাতের বিয়ে বাড়ির আমোদে উৎসবে এমন করে মেশেও নি। সেখানকার মাছ তরকারি, এই মিষ্টান্নের স্বাদই যে কেশবের জিভে লেগে রয়েছিল তাই নয়। কিসের যেন ভারি মিষ্টি একটু গন্ধও তার শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে জড়িয়ে এসেছিল। বাসি বিয়ের দিন একটু বেলা হলে খই মুড়ি দিয়ে তাদের জলখাবারের ব্যবস্থা করে দিয়ে গিয়েছিল একুশ বাইশ বছরের একটি ফর্সা সুন্দরপানা মেয়ে। কেশব পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিল যে মেয়ের বিয়ে হল এটি তার বড় বোন। দেখতে বিয়ের কনের চেয়েও সুন্দরী। সিন্দুরের সরু দাগ ছিল সিঁথিতে আর ভিজে চুলের রাশে তার সমস্ত পিঠ ঢেকে গিয়েছিল। কেশবের শ্বাস-প্রশ্বাসের

সঙ্গে বিয়ে বাড়ির যে গন্ধ জড়িয়ে এসেছে সে গন্ধ ঠিক যেন সেই মেয়েটির চুলের গন্ধের মত।

মাঠ ছাড়িয়ে দল নিয়ে পাড়ার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে গগন ঢুলী, ভুঁইমালীদের জলধর, অশ্বিনী আর নন্দ এসে পথ আটকে দাঁড়াল, 'থামো।'

কিসের একটু একটু সোরগোল আগে থেকে কানে যাচ্ছিল গগনদের কিন্তু জলধরের রুখে দাঁড়াবার ভঙ্গি দেখে সবাই অবাক হয়ে গেল। গগন বলল, 'ব্যাপার কি, হল কি তোমাদের ভুঁইমালী।'

জলধর প্রায় গর্জে উঠল, 'কি হল তা আবার মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করছ? লজ্জা করছে না বলতে?'

গগনের চেয়ে বছর কয়েকের বড়ই হবে জলধর। মাথার চুল সবই প্রায় পেকে সাদা হয়ে গেছে। গগনের মত অমন শক্ত-সমর্থ চেহারাও তার নেই। আকৃতি খুব লম্বা বলেই যেন সামনের দিকে একটু বেশি নুনে পড়েছে বলে মনে হয়।

ওপর আর নিচের পাটি মিলিয়ে চার পাঁচটির বেশি দাঁত নেই সামনের দিকে, রাগের চোটে দাঁতের ফাঁক দিয়ে একটু থুথুর ছিটে এল গগনের গালে। বিরক্ত হয়ে দু পা পিছিয়ে গেল গগন, আঙুলের ডগা দিয়ে থুথুটুকু মুছে ফেলতে ফেলতে গগন বলল, 'আঃ একটু আস্তে আস্তে কথা বল জলধর। থুথু ছিটছে তোমার মুখ থেকে।'

জলধর মোটেই অপ্রতিভ হল না, বলল, 'ছিটুক, তোমরা ইচ্ছে করে সমস্ত ভুঁইমালী পাড়ার মুখে থুথু ছিটিয়েছ, চুন-কালি দিয়েছ আমাদের মুখে, থুথু তো ভাল, ঢুলী পাড়ার মুখ ভরে বমি করলেও তো শোধ যায় না তার, জ্বালা মেটে না, রাগ মেটে না গায়ের।'

মনে মনে সবই বুঝতে পেরেছিল গগন কিন্তু না বোঝার ভান করে ভাল মানুষের মত বলল, 'কেন করেছি কি, কি এমন মহা ক্ষেতি করেছি ভুঁইমালীদের?'

নন্দ ভুঁইমালী এগিয়ে এসে বলল, 'এর চেয়ে আবার কি ক্ষেতি করবে গগন ঢুলী। চুরি করবে, না ডাকাতি করবে, না মেয়ে-বউ বের করে নি[illegible] যাবে ঘর থেকে। তার চেয়ে বেশি ক্ষেতি করেছ। ভুঁইমালীর ছেলেকে দিয়ে [illegible] বাজিয়েছ। জাত মেরেছ ভুঁইমালীদের। জাতকে জাত-সুদ্ধু বেইজ্জত করে আবার বলছ কি ক্ষেতি করেছি।'

গোলমাল শুনে ভুঁইমালী পাড়া আর ঢুলী পাড়ার আরও দু'চার জন করে এসে জমতে লাগল মাঝখানের ঝাঁকড়া আমগাছের তলায়। কুণ্ডুদের চৌধুরীদেরও কেউ কেউ এসে দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল।

অশ্বিনী ভুঁইমালী অনুযোগ করল স্বয়ং কেশবকে, 'আচ্ছা, তুই নিজেই বা কোন আক্কেলে গেলি কেশব। একটু লজ্জা হল না, একটু ভয় হল না, ধর্মের, সমাজের। ডাকা মাত্রই ঢুলীদের দলে গিয়ে মিশলি তুই, এঁটো বাঁশী বাজালি ভরত ঢুলীর মুখের। ছি ছি ছি, সমস্ত জাতটার মুখ হাসিয়ে ছাড়লি তুই কেশব, কি রকম মানুষ রে তুই, একটু মায়া হল না, জাতের জন্যে, সমাজের জন্যে।

প্রথমটায় একটু একটু হাসি পাচ্ছিল কেশবের কিন্তু অশ্বিনীর অভিযোগের ভঙ্গিতে ঠিক যেন হাসি এল না। এতো কেবল শাসন আর অভিযোগ অনুযোগ নয়, করুণ আবেদনের সুর বাজছে অশ্বিনীর গলায়। অশ্বিনীর হয়ে সমস্ত ভুঁইমালী জাতটা যেন তার কাছে সখেদে নালিশ জানাচ্ছে। এমন শাস্তি, এমন লাঞ্ছনা সে কোন প্রাণে দিল গোটা জাতকে। একটু কি দুঃখ হল না তার, একটু কি লাগল না বুকে যে বাপ-দাদা চোদ্দপুরুষের এমন পবিত্র জাতটাকে সে কলঙ্কিত করে ফেলল। কেমন করে উঠল যেন কেশবের বুকের মধ্যে। চড়া সুরে যে কথা বলতে যাচ্ছিল তা আর বলা হল না। অশ্বিনীর কথার জবাবে কেশব বলল, 'ঢুলীদের দলে সানাই বাজিয়েছি কে বললে তোমাদের অশ্বিনী কাকা। আমার কি এতটুকু জ্ঞানগম্যি নেই, আক্কেল পছন্দ নেই, জাত-মানের ভয় নেই যে করতে যাব। আমি অমনই বেড়াতে গিয়েছিলাম। একটু ঘুরে-টুরে মজা দেখে খেয়ে-দেয়ে এলাম। চণ্ডীপুর তো এমন বেশি দূর নয়। সেখানে সবাই আমাকে চেনে জানে। আমাকে সানাই বাজাতে বলবে ঢুলীদের মধ্যে কার এমন সাহস আছে শুনি? কার এমন বুকের পাটা আছে?'

মিনিট কয়েক আগেও যে সম্মানে, যে গৌরবে মন ভরে রয়েছিল কেশবের, সমস্ত ভুঁইমালী জাতের মান রাখবার জন্যে সেই কৃতিত্ব আর গৌরব একেবারে অস্বীকার করে ফেলল কেশব। কোন সঙ্কোচ নেই, কিছুমাত্র যেন দ্বিধা নেই তার মনে।

কিন্তু যাদব আর রামলাল অত সহজে ছেড়ে দিল না তাকে। জাত তুলে গাল দেওয়ায় তারা ততক্ষণে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। ভিড় ঠেলে যাদব

কেশবের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বলল, 'খবরদার কেশব, জাত তুলে কথা বলিস নে। ঢুলীরা তোর মত অমন মিথ্যুক কেউ নয়। ভাত খেয়ে-মুছে তারা তোর মত অমন কেউ বলতে পারে না যে খাই নি। সাঁচ্চা কথা বল কেশব, আমার চোখের দিকে তাকিয়ে যা করেছিস সব সত্যি করে বল, মিথ্যে বললে, ঘা হবে জিভে, আলজিভ সুদ্ধু খসে পড়বে। ভরত ঢুলীর মুখের সানাই বাজাস নি তুই, ভাত খাস নি তিন বেলা আমাদের মধ্যে বসে। সাহস আর বুকের পাটা ঢুলীদের সবারই আছে। কেবল তোরই নেই। কি করে থাকবে। ঢুলীদের ভাতই কেবল খেয়েছিস কিন্তু জাত তো বদলাতে পারিস নি।'

গগন বলল, 'আঃ, থাম যাদব, তুই একটু থাম না। সত্যিই তো, কেশব কেন সানাই বাজাতে যাবে আমাদের দলে,—'

যাদব এবার রুখে উঠল গগনের ওপর, 'তুমি চুপ কর বুড়ো। তোমার মত অত প্রাণের ভয় নেই আমাদের। তোমার মত অত ঠাণ্ডা হয়ে যায় নি আমাদের গায়ের রক্ত যে লোকজন দেখে ভয়ে পিছিয়ে যাব, ভয় পাব সাঁচ্চা কথা বলতে। প্রাণের চেয়ে জাত-মানের দাম আমাদের কাছে অনেক বেশি। অত যদি ভয়ডর তোমার, বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছ বউ আছে ঘরে তার আঁচলের তলায় লুকিয়ে থাক গিয়ে যাও।'

কুণ্ডুদের হরিদাস পিছনে দাঁড়িয়ে কৌতুক দেখছিল। যাদবদের কথা শুনে মন্তব্য করল, 'না হে যাদব, সে দিন কাল আর নেই। বউ তো একজন না একজন সবার ঘরে আছে। কিন্তু লুকাবার মত লম্বা আঁচল আছে ক'জনের বউয়ের। যা শাড়ি কন্ট্রোলের তাতে নিজের অঙ্গই সবটুকু ঢাকে না তারপর আবার স্বামীকে লুকাবে।'

হরিদাসের কথার ভঙ্গীতে পিছনের দর্শকদের অনেকেই হেসে উঠল। একটু হালকা হল আবহাওয়াটা। জলধর বলল, 'সে মেনে নিচ্ছে যাদবদের কথাই সত্যি। ভয় পেয়ে কেশবই মিথ্যে কথা বলেছে। কিন্তু সানাই যদি গিয়ে বাজিয়েই থাকে কেশব দোষটা কার? তার না ঢুলীদের? গাঁজা খেয়ে তাড়ি খেয়ে মাথার তো কোন ঠিক নেই কেশবের। তার বয়সটাই বা এমন কি। তেইশ চব্বিশ বছরের বেশি নিশ্চয়ই নয়। ষাট বছরের বুড়ো গগন ঢুলী তাকে লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে নিয়ে গেল কোন্ আক্কেলে। এখন মিথ্যা কথা বলেই বুঝি ছাড়া পাবে ভেবেছে। অত কাঁচা ছেলে, কাছা খোলা

মানুষ জলধর নয়। এখনও বেঁচে আছে ভুঁইমালীরা। অত সহজে তারা ছেড়ে দেবে না ঢুলীদের। একি মগের মুল্লুক, যে যার যা খুশি সে তাই করবে। একটা বিচার আচার নেই, শালিস দরবার নেই গাঁয়ে।'

যাদব রাজী হয়ে বলল, 'বেশ তো হোক না বিচার আচার, বসুক না দরবার শালিস। তাতেও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু জাত তুলে গাল দিলে আমরাও চুপ করে থাকব না, অযথা দোষারোপ করলে মুখ বুজে হজম করে যাওয়ার মত ঠাণ্ডা মানুষ গগন ঢুলী হতে পারে কিন্তু সে ছাড়া আরও মানুষ আছে ঢুলীদের পাড়ায়, কথা বলবার আরও লোক আছে আমাদের।'

মাথায় পাগড়ীর মত করে বাঁধা রঙীন শাড়িখানা কেশব খুলে দিল গগনের হাতে। সানাইটা যাদবের কাছে আগেই ফেরত দিয়েছিল। ভুঁইমালীর দলের পিছনে পিছনে নিঃশব্দে সে এগিয়ে যেতে লাগল।

ঢুলীপাড়ার ভিতর দিয়েই যেতে হয় ভুঁইমালী পাড়ায়, খানিকটা পথ এগুতেই দেখা হল সিন্দুরের সঙ্গে, ভরত যখন বাড়ি থাকে না তখন বাড়িটা একান্তই বাপের বাড়ি সিন্দুরের। পাড়ার সকলের সামনেই বের হয়, সকলের সঙ্গেই কথা বলে। চালচলনে কোন রকম আড়ষ্টতার বালাই নেই, লাজ-লজ্জাটাও সমবয়সী বউ-ঝিদের চেয়ে কম।

সিন্দুর বলল, 'ব্যাপার কি বাবা। গাঁয়ে ঢুকতে না ঢুকতেই এত চেঁচামেচি হচ্ছিল কিসের তোমাদের। বাবারে বাবা নাইতে গেছি ঘাটে। ডুব দিয়ে সেরে আসতে পারি কি পারি না। জলের তল পর্যন্ত তোমাদের গলা গিয়ে পৌঁছেছে। হয়েছে কি।'

গগন ধমকের সুরে বলল, 'মেয়েমানুষ হয়ে সে সব কথায় তোর কাজ কি সিন্দুর, যা এগুলি নিয়ে এখন ঘরে যা, শুনতে হয় পরে শুনিস সব।'

সানাই আর বকশিশ পাওয়া পুরোনো রঙীন শাড়িখানা মেয়ের হাতে ধরে দিল গগন।

কিন্তু সিন্দুরের কৌতূহল তবু থামতে চায় না। বাপের কাছ থেকে কথার জবাব না পেয়ে সে জিজ্ঞাসা করল যাদবকে, 'হয়েছে কি রাঙা-কাকা, কেউ তোমরা কোন কথা বলছ না যে।'

যাদবও গম্ভীর হয়ে জবাব দিল, 'এখন ঘরে যা সিন্দুর। কি হয়েছে না হয়েছে শুনিস তোর বাপের কাছে।'

সবারই এখন গম্ভীর থমথমে ভাব দেখে সিন্দুর মনে মনে ভারি কৌতুক

বোধ করল। কেশব যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। কিন্তু পথ আগলে সিন্দুর গিয়ে দাঁড়াল তার সামনে। তারপর তার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'বলি হয়েছে কি ছোট বৈরাগী। গাঁ সুদ্ধ লোক রাগে যে একেবারে গুম মেরে রয়েছ। কারও মুখে কোন কথাই নেই, বলি হল কি তোমাদের?'

মাধবদাসের আখড়ায় বেশির ভাগ সময় থাকে এবং তার গাঁজার কলকের প্রসাদ পায় বলে পাড়ার মেয়েদের অনেকেই কেশবকে আড়ালে আবডালে ছোট বৈরাগী বলে ডাকে, বোষ্টম ঠাকরুণের সঙ্গে অল্প অল্প একটু মধুর সম্পর্কও যে আছে কেশবের কথাটার মধ্যে সেই তামাসাটুকু ভরে দিতে চায়। কিন্তু সিন্দুর অত আড়াল আবডাল মানে না। সম্বোধনটা সে সামনা-সামনিই করে কেশবকে। প্রথম প্রথম কেশব ভারি চটে যেত প্রায় তেড়ে আসত মারতে কিন্তু শুনে শুনে আজকাল কানে সয়ে গেছে কেশবের।

সিন্দুরের কথায় চমকে উঠে কেশব তার মুখের দিকে তাকাল, কিন্তু তাকাবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয়বার চমকে উঠল কেশব, সিন্দুরও সদ্য স্নান করে কাপড় ছেড়ে এসেছে, পিঠভরে ছড়িয়ে পড়েছে তার চুলের রাশ, কেবল তাই নয়, বিয়ে বাড়ির কনের সেই ফর্সা পানা দিদির সুন্দর মুখের সঙ্গে অনেকখানি মিলও যেন রয়েছে সিন্দুরের মুখের। সবখানি নয়, সিন্দুরপরা কপাল, নাক চোখের আদল সেই কনের দিদির মত। কিন্তু নিচেরটুকু? পাতলা ঠোঁট আর ছোট্ট থুতনি যে অবিকল সেই রাঙা চেলী পরা বিয়ের কনের জিনিস!

নিজের কৌতুকেই নিজে মগ্ন ছিল সিন্দুর। কেশবের চমকানোটা লক্ষ্য করল না। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে আর একবার খোঁচা দিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'বলি ভাঙোই না একটুখানি গোমর। এত হৈচৈ করছিলে কেন সবাই। হয়েছিল কি।'

বুকের মধ্যে যেন কেমন করে উঠল কেশবের। সিন্দুরের মুখের দিকে চেয়ে মৃদু হেসে বলল, 'হয় নি তেমন কিছু। লোকে বলাবলি করছিল আমার নাকি জাত গেছে?'

হাসতে হাসতে পথের মধ্যে প্রায় লুটিয়ে পড়তে চাইল সিন্দুর: 'ওমা তাই নাকি। তোমার আবার যাওয়ার মত জাত-জন্ম ছিল নাকি ছোট বৈরাগী? তা কেমন গেল, কি বিত্তান্ত একটু খুলে-টুলে বলেই যাও না ব্যাপারটা।'

ততক্ষণে গগন আর যাদবের দল এসেছে, গগন গিয়ে থাবা দিয়ে হাত ধরল মেয়ের, 'আর হাসিস নে সিন্দুর, সব্বনাশ করিস নে আমার, ঘরে আয়।'

এমন আতঙ্কের সুর বাপের মুখের কোন দিন আর শোনে নি সিন্দুর।

চমকে উঠে গগনের মুখের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে শান্ত বাধ্য মেয়ের মত বলল, 'চলো।'

গগনের মুখ দেখে অবাক হয়ে গেছে সিন্দুর। হঠাৎ অত ভয় পেয়েছে কেন তার বাবা। কেশবের জাত যাওয়ার সঙ্গে সিন্দুরের হেসে ওঠার সঙ্গে এমন কি সম্পর্ক আছে তার বাবার উদ্বেগ আতঙ্কের?

সাত আট হাত লম্বা একখানা করাতের দুই প্রান্ত দু'জনে কাঁধে নিয়ে ভরত ঢুলী আর শুকচাঁদ ভুঁইমালী পরদিন দুপুর বেলায় গাঁয়ে এসে পৌঁছল, উত্তর অঞ্চলে সাড়ে সাত কাঠির সিকদারদের কাঠ থলিতে করাতের কাজে গিয়েছিল ভরত মাস খানেক আগে। কাজ ভালই চলছিল। নদীর পাড়ে বেশ কাঠের আড়ত সিকদারের, মোটা মোটা সব শালকাঠের গুঁড়িতে বালির চর পড়া নদীর ধারটা ঢেকে গেছে। দিনভর করাত চলছে পনের বিশখানা। সিকদারদের আড়তের দু'তিনজন কর্মচারী ফতুয়া গায়ে গোল ফিতে হাতে চটিজুতার চটপট শব্দ করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ফিতে ধরে ধরে মাপ-জোপ করে চকখড়ির দাগ দিয়ে কাঠ ফাড়বার জায়গা দেখিয়ে দিচ্ছে করাতীদের, ঘরের খুঁটি, আঠন, বাতা, নৌকার তক্তা—ফেঁড়ে ফেঁড়ে নানারকম জিনিসই বের করেছে করাতীরা শালকাঠের গুঁড়ি থেকে। দু'সপ্তাহ যেতে না যেতেই সব বিক্রি হয়ে যাচ্ছে। বেশ ভাল কারবার সিকদারদের। ধারে কাছে এত বড় কাঠের আড়ত আর কোন গঞ্জে বন্দরে নেই। শুকচাঁদ অনেক দিন ধরে কাজ করছে এখানে। সেই সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল ভরতকে। ঘরজামাই [illegible] এ গ্রামে আসা অবধি শুকচাঁদ ভুঁইমালীর সঙ্গে ভারি মনের মিল ভরতের। তার বুদ্ধি পরামর্শ ছাড়া ভরত চলে না। শুকচাঁদই খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে করাতের কাজে নামিয়েছে তাকে। বলেছে এমন লম্বা চওড়া চেহারা, শালকাঠের মত এমন শক্ত মজবুত দেহ আর দেহ-ভরা এত তাগদ থাকতে কেবল সানাই ফুঁকেই জীবন কাটাবি ভরত। অবসর সময়ে কোন কোন দিন উঠানে স্ত্রীর

সঙ্গে বেতের কাজ বাঁশের কাজ নিয়ে বসেছে ভরত। ধামা বেঁধেছে, সের টুরি বেঁধেছে, বাঁশের বেতী তুলে কুলো চালুনি, মাছের খালুই, ফুলের সাজি তৈরি করেছে ভরত। তামাক খেতে খেতে শুকচাঁদ বন্ধুর দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে হেসেছে। 'এক কাজ কর ভরত, বউয়ের মত তুইও শাঁখা চুড়ি পর। চুড়ি না পরলে অমন মেয়েলী মিহি কাজে হাত খুলবে না। তোর চেয়ে সিন্দুরের হাতের কাজ ঢের ভাল।'

সিন্দুর মুখ টিপে টিপে হেসেছে, 'এত রঙ্গও জানো তুমি শুকো দাদা।'

কাজ ফেলে ভরত হঠাৎ ডান হাতখানা এগিয়ে দিয়েছে শুকচাঁদের দিকে, 'পরা দেখি এ হাতে শাঁখা চুড়ি বুঝব ক্ষমতা। চোখ বুঝে দেখ দেখি একটু টিপে, মেয়েলী হাতের আরামটা হাতে করে একটু নিয়েই যা না শুকচাঁদ।'

অনেকক্ষণ সময় নিলেও শুকচাঁদেরই শেষ পর্যন্ত হার হয়েছে ভরতের কাছে। কিন্তু তার কথার কাছে বুদ্ধির কাছে হার মেনেছে ভরত। শুকচাঁদ তার গোঁ ছাড়ে নি। বলেছে 'অমন ষাঁড়ের মত চেহারা, জোর তো গায়ে থাকবেই, কিন্তু ঘিলুর বদলে ষাড়ের গোবরও রয়েছে মাথার মধ্যে। নইলে এমন তাগদ নিয়ে কেউ কি কেবল সানাই বাজায় আর বেত ফোঁড় বাঁশ ফোঁড়ের কাজ করে।'

শুকচাঁদের ঠাট্টা টিটকারীতে খুব বেশি চঞ্চল হয় নি ভরত, পরিহাসের বদলে সেও পরিহাস করেছে। কিন্তু স্থির থাকতে পারল না আকালের বার যখন না খেয়ে ছেলে মরল, শুকিয়ে চর্মসার হল নিজে আর বউ, জাত-ব্যবসার মায়া সেদিন আর তাকে বেঁধে রাখতে পারল না, সানাই বাজিয়ে আর বেত বাঁশের ধামা-কুলো বানিয়ে যে তিরিশ দিন খাওয়া-পরা জুটবে না সে সম্বন্ধে আর কোন সন্দেহ রইল না তার। মরে-হেজে ঢুলীপাড়া তখন প্রায় সাফ হয়ে গেছে। যারা আছে তারাও বামুন, কায়েত, সাহা, কুণ্ডুদের বাড়ি কেউ চাকর খাটছে কামলা খাটছে, নৌকা বাইছে, কুড়ুল কুপিয়ে কুপিয়ে চেলা করছে কাঠ, কেউ বা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে শহরে গঞ্জে আর ফিরে আসে নি। শ্বশুর গগন ছাড়া সবাই জাত-ব্যবসা ত্যাগ করেছে, মমতা কাটিয়ে উঠেছে ভুয়ো মান সম্মানের। ভরতও গিয়ে যোগ দিল শুকচাঁদের সঙ্গে, কাঠ থলিতে গিয়ে করাত ধরল, মিথ্যা আশ্বাস দেয় নি শুকচাঁদ। মেহনত যেমন আছে, পয়সাও তেমনি আছে এসব কাজে। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই অবস্থা ফিরিয়ে ফেলেছে ভরত। খেয়ে পরে ঘরে বাইরে দুজনেরই কান্তি ফিরেছে। তামা-

কাঁসা যা বাঁধা বিক্রি করতে হয়েছিল প্রায়ই ভরত উদ্ধার করে এনেছে, রূপার কানফুল আর চারগাছা করে সরু চুড়ি গড়িয়ে দিয়ে ফের হাসি ফুটিয়েছে সিন্দুরের মুখে। ভরতের ঘরে সেবারকার আকালের আর কোন চিহ্ন নেই, কেবল মরা ছেলে ফিরে আসে নি সিন্দুরের কোলে। তাই নিয়ে মাঝে মাঝে অবশ্য হা হুতাশ করে সিন্দুর, আক্ষেপ করে বলে, 'লক্ষ্মীর যেমন দুটি গেছে, তেমনি দুটি এসেছে কিন্তু বিচার দেখ একচোখো ভগমানের। আমার কোলের দিকে তার আর নজরই নেই।'

কিন্তু দুঃখটা বেশিক্ষণ মনে থাকে না সিন্দুরের, দুদণ্ড যেতে না যেতেই ঘরকন্না সাজসজ্জা নিয়ে ফের মেতে ওঠে।

সাড়ে সাত কাঠির কাঠ থলিতে আরও বেশ কিছুদিন কাজ করা চলত। কিন্তু পাঁচ সাতদিন ধরে ভরত খুব ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কেবলই তাগিদ দিচ্ছিল শুকচাঁদকে, 'চল এবার বাড়ির দিকে, ঘুরে-টুরে ফের না হয় আসা যাবে।'

'কেন রে, পরিবারের জন্যে মন কেমন করছে নাকি? আরে পরিবার তো একটি একটি আমাদের ঘরেও আছে। কিন্তু তোর মত বউপাগলা পুরুষ করাতীর দলে যদি আর দুটি থাকে। চল, আজ আবার নিয়ে যাচ্ছি তোকে গোলাপীর কাছে। দুদণ্ডে মন ভাল করে দেবে?'

শুকচাঁদের কথায় ভরত বিরক্ত হয়ে জবাব দিয়েছে, 'কি বাজে বক্‌বক্‌ করছিস শুকচাঁদ, তোর মত অমন মেয়েমুখো মন সবারই নয়। মেয়েমানুষ ছাড়া সংসারে আর বুঝি কিছুর জন্যে মন পোড়ে না, প্রাণ কাঁদে না, দুনিয়ায় পুরুষমানুষের সাধ-আহ্লাদের আর বুঝি জিনিস নেই কোন? বিয়ে-সাদির মরশুম পড়ল, এ সময় আমি না থাকায় বুড়োর একা একা কত অসুবিধা হচ্ছে ভেবে দেখ দেখি।'

দেশলাইয়ের কাঠি জ্বেলে বিড়ি ধরাতে ধরাতে শুকচাঁদ মুখ টিপে হেসেছে, 'বাবারে বাবা, ধন্য মন তোর ভরত, বুড়োর ছুঁড়ী মেয়েটার জন্যেই সে মন কেবল কেঁদে আকুল হয় না, ছুঁড়ীর বুড়ো বাপটির জন্যেও কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে দেয়। ভয় নেই, তোর জন্যে হা পিত্যেশ করে এতদিন বসে নেই গগন ঢুলী, সানাই ধরবার লোক নিশ্চয়ই সে এর মধ্যে আর কাউকে খুঁজে বের করেছে!'

কথাটা ভরতের বিশ্বাস হয় নি। তার মত সানাইদার ধারে কাছে আর কেউ নেই, গাঁয়ের ঢুলীদের মধ্যে যে ক'জন বেঁচে আছে তারা সানাই কেউ

খরতেই জানে না। এ তো আর খেলার মাঠের হুইসেল নয়, যে ফুঁ দিলেই বেজে উঠবে। বিদ্যা জানা চাই, তাল-মান জ্ঞান থাকা চাই সানাইদারের। ভিনগাঁয়ের ঢুলীর দল থেকে হয়ত কাউকে সেধে ভজে নিয়ে আসতে পারে গগন, কিন্তু যেমন চড়া ধাত, আর কড়া মেজাজের মানুষ সে, আর যেমন সম্পর্ক তার অন্যান্য ঢুলীর দলের সঙ্গে তাতে এই বিয়ের মরশুমের সময় লোক যোগাড় করা তার পক্ষে যে কি শক্ত সে কথা ভরত ভাল করেই জানে। তার আশঙ্কা হল খালি বাড়ি পেয়ে সিন্দুরকে খুব হয়ত বকাবকি করছে গগন। রাগলে তো বুড়োর আর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। যা মুখে আসে তাই বলে, দিনের মধ্যে পাঁচবার তুলে দিতে চায় বাড়ি থেকে ; তবে ভরসা এই সিন্দুরও মুখ বুজে থাকবার মেয়ে নয়। চটালে খোঁচালে বাপ বলে ছেড়ে কথা কইবে না। বাপের বাপ থেকে শুরু করে চৌদ্দপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়বে। কিন্তু দিনরাত তিরিশ দিন ঝগড়া-বিবাদ আর ভাল লাগে না ভরতের, ঘরজামাই হয়ে আর সে থাকবে না শ্বশুরের ভিটেয়। আম নিয়ে জাম নিয়ে, বাঁশ নিয়ে, বেত নিয়ে শ্বশুরের সঙ্গে ঝগড়া তার লেগেই আছে। এবার সে সাড়ে সাত কাঠির গঞ্জে বাসা বেঁধে সেখানে এনে তুলবে সিন্দুরকে। সত্যি সত্যি সানাইয়ের ভরসায় তো আর বারোমাস বাড়ি বসে থাকতে পারবে না। পেট তো আর ভরবে না তাতে। আর পাঁচজনের মত গাঁয়ের এবাড়ি সেবাড়ি চাকর-কামলা খাটতেও পারবে না। তার চেয়ে গঞ্জে বন্দরে করাতী মিস্ত্রীর কাজ ঢের বেশি সম্মানের। আর রোজগারও তাতে ভাল। কিন্তু সিন্দুরকে রাখতে হবে সঙ্গেই। নইলে শুকচাঁদের পাল্লায় পড়ে সে রোজগারের প্রায় আধা-আধি নানা বদখেয়ালে বেরিয়ে যাবে।

মাঠটি ছাড়াতেই দেখা হয়ে গেল মুকুন্দ মালীর সঙ্গে। কাঁচা সোলার আঁটি কাঁধে নিয়ে চর কাসিমপুর থেকে ফিরছিল মুকুন্দ ; ভরতকে দেখে মুখ মুচকে হেসে বলল, 'ভাল সময়েই ঘরে ফিরেছিস ভরত, আর একটা দিন দেরি করলে দরবারটায় থাকতে পারতিস না।'

ভরত বিস্মিত হয়ে বলল, 'কিসের দরবারের কথা বলছ মুকুন্দদা।'

মুকুন্দ গোমর ভাঙতে চায় না সহজে, এড়িয়ে যাওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'অত তাড়া কিসের। এসেছিস যখন, ঘরে গিয়েই সব শুনতে পারবি।'

ভরত বলল, 'তাতো শুনবই। কিন্তু দরবারটি তো আর ঘরের নয়, বাইরেরই, তুমিই বল না ব্যাপারটি কি।'

শুকচাঁদ ট্যাঁক থেকে বিড়ি বের করে দিল মুকুন্দের হাতে, বলল, 'ধরাও দাদা। ধরাতে ধরাতে বল।'

একটু রেখে-ঢেকে চেপে-চুপে বলবার ভঙ্গি করলেও আসলে চাপল না মুকুন্দ কিছুই। ভুঁইমালীর ছেলে হয়ে কেশবের ঢুলীর দলে সানাই বাজাতে যাওয়ার কথা থেকে শুরু করে বিয়ে বাড়িতে বকশিশ পাওয়া গোলাপী পাগড়ী মাথায় জড়িয়ে তার ফিরে আসা পর্যন্ত কাহিনীই রসে রঙে রঞ্জিত করে মুকুন্দ বর্ণনা করল। কিসের লোভে, কার প্ররোচনায় যে এমন মতিগতি হয়েছে কেশবের সে সম্বন্ধেও ইসারা ইঙ্গিত দিতে বিন্দুমাত্র কার্পণ্য করল না মুকুন্দ। তুই পাড়ায় ব্যাপারটি নিয়ে যে খুব কানাকানি, আর গা টেপাটেপি চলছে, স্ত্রীর কাছ থেকে একথা নাকি মুকুন্দ নিজেই স্বকর্ণে শুনেছে। তা লোকের আর দোষ কি। বয়স তো আর কম হয় নি গগন ঢুলীর। চুল দাড়ি তো প্রায় আধাআধি পেকে উঠেছে। ভুলিয়ে-টুলিয়ে পরের ছেলের জাত মারতে যাওয়া গগনেরই কি সঙ্গত হয়েছে, ঢুলীর পাতের মধ্যে খোঁজাখুঁজি করলে আর কি সানাইদার জুটত না কেউ, নাই যদি জুটত, তাহলে বিনা সানাইতেই না হয় বায়না রাখতে যেত গগন কিংবা একটা বিয়ের বায়না হাতছাড়া হলে সে আর না খেয়ে মরত না। কিন্তু নিজের সামান্য স্বার্থের জন্যে কেশবের মত অমন একজন মাথাপাগলা ছেলের সর্বনাশ করা মোটেই উচিত হয় নি গগনের। তাতে কেবল অন্যের কুলেই কালি লাগে নি নিজের মুখেও চুন-কালি পড়েছে। দরবারে বিচার হবে গগন ঢুলীর। ঢুলীপাড়া আর ভুঁইমালীপাড়ার যে খোলা চটান জায়গাটি আছে মাঝখানে সন্ধ্যার পর তুই জাতের মাতব্বর মুরুব্বিরা সেখানে বৈঠক বসাবে। কালই হয়ে যেত দরবারটা, হাটবার বলেই কেবল হতে পারে নি। ভাগ্য ভাল ভরত আর শুকচাঁদের যে তারা ঠিক সময়মতই এসে পৌঁছেছে।

শুকচাঁদ কৌতুক বোধ করে বলল, 'বটে! মাসখানেক গাঁয়ে ছিলাম না, এর মধ্যে এত কাণ্ড। বল কি মুকুন্দদা—'

শুনতে শুনতে ভরতের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠেছিল। বিরক্ত হয়ে ধমকে দিয়ে সে থামাল শুকচাঁদকে, তারপর মুকুন্দের দিকে চেয়ে ক্রুদ্ধ কর্কশ গলায় বলল, 'মিথ্যা বদনাম যদি রটাও পরের ঘরের পরিবারের নামে তোমাকে আমি আস্ত রাখব না মুকুন্দমালী, পষ্ট বললুম তোমাকে, বামুনের গা-ই চাট আর কায়েতের পা-ই চাট, তোমার কোন বাবা এসে তোমাকে রক্ষা করতে পারবে না।'

মুকুন্দ ভ্রূ কুঞ্চিত করে একবার তাকাল ভরতের দিকে তারপর ফের ঠাণ্ডা মেজাজে মৃদু একটু হাসল, বলল, 'তোর দোষ নেই ভরত, বিদেশ থেকে ঘরে এসে এসব কথা শুনলে মাথা গরম সবারই হয়। গুরু লঘু জ্ঞান থাকে না, হিতাহিত জ্ঞান থাকে না, বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে যায় এমন অবস্থায়। নেড়ী কুকুর এসে ঘরের হাঁড়িতে মুখ দিয়েছে শুনলে কোথায় মানুষ হাঁড়ি বদলাবে, মুগুর নিয়ে ছুটবে কুকুরের পিছনে পিছনে তা নয় তো যে দেখেছে তার চোখ টিপে ধরতে চায়, যে বলেছে তার গলা টিপতে আসে। এই রকমই হয় ভরত, তুনিয়ার নিয়মই এই।'

ভরত ডাক ছেড়ে বলল, 'নিয়ম অনিয়ম তোমার কাছে শুনতে চাই নি মুকুন্দমালী, যা বললে তার এক বন্নও যদি মিথ্যে হয় তাহলে তোমার একদিন কি আমার একদিন। ঘরের পরিবারের জন্যে তাহলে এখনি গিয়ে সাদা থানের ব্যবস্থা করে এস, যাও।'

এত অপমানেও মুকুন্দ কিন্তু মেজাজ নষ্ট করল না কি মুখও খারাপ করল না, সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে ঠোঁটে তেমনি হাসি টেনেই বলল, 'আমার পরিবারের সাদা থানের কথা পরে ভাবিস ভরত; আগে নিজের পরিবারের রঙীন শাড়িখানা তু'চোখ ভরে একবার দেখে নে, দেখছিস কি রকম বাহার খুলেছে রঙের। কাল ঐ শাড়িতে মাথায় পাগড়ী বেঁধে ছিল কেশব, আজ তা শ্রীরাধার অঙ্গ ঢেকেছে। চেয়ে চেয়ে তুই দেখ ভরত, আমার ভাই আর সময় নেই এখন। অনেক কাজ আছে হাতে।'

মুকুন্দ আর দাঁড়াল না, সোলার আঁটি কাঁধে তাড়াতাড়ি পাশ কাটিয়ে চলে গেল।

ভরত তাকে আর ধরতে চেষ্টা করল না। আঙুলের ডগা বাড়িয়ে মুকুন্দ যে দিকটা তাকে দেখিয়ে দিয়েছিল সেই দিকেই স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। স্নান সেরে কলসী কাঁখে আশ-শেওড়ার ঝোপের ভিতর দিয়ে নদীর ঘাট থেকে আজও বাড়ি ফিরছে সিন্দুর। তার পরনে ফিকে গোলাপী রঙের একখানা শাড়ি। কিন্তু ভরতের চোখে সে রঙ আগুনের হল্কার মত লাগতে লাগল। জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখল ভরত, সিন্দুর তাকে দেখে মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকল। ভরত গেল পিছনে পিছনে।

শুকচাঁদ বলল, 'এই ভরত, শোন্ শোন্।'

ভরত মুখ ফিরিয়ে জবাব দিল, 'খবরদার, এ সময় ইয়ার্কি দিতে আসিস নে শুকচাঁদ। আমার মাথার ঠিক নেই।'

ঘরে এসে কাঁখ থেকে জলের কলসী নামিয়ে রাখল সিন্দুর। ভরত তার আগেই এসে ঘরে ঢুকেছে। ঘোমটা তুলে স্বামীর গম্ভীর মুখের দিকে তাকিয়ে সিন্দুর একটু মুখ টিপে হাসল, 'শেষটায় অমন তাড়াতাড়ি ছুটে এলে কেন বল দেখি। প্রথমে তো খুব পিছনে পিছনে পা টিপে টিপে আসা হচ্ছিল। ভয়ে মরি কে না কে, পর-পুরুষ না আপন পুরুষ। হাতই চেপে ধরে না চোখই টিপে ধরে পিছন থেকে। অমন নিরালা বাঁশ ঝাড়ের ভিতর দিয়ে পথ—'

খানিকটা আগেকার ইতিহাস ছিল এসব কথার। বছর কয়েক আগেও দিন নেই দুপুর নেই স্ত্রীকে একা পেলেই বাঁশ ঝোপের পথে ভরত এমনি করে তার পিছু নিত। কোনদিন বা চেপে ধরত হাত, কোনদিন বা টিপে ধরত চোখ।

সিন্দুর বলত, 'ছাড় ছাড়, লোকে দেখলে কি বলবে বল দেখি।'

ভরত বলত, 'বলবে আবার কি। এ তো আর পরের পরিবার নয়, আপন জন, আপন পরিবার। লোকের বলাবলির অত ধার ধারি কিসের, ভয়ই বা কিসের অত।'

সিন্দুর হেসে বলত, 'তাই নাকি। তোমার ধরণ ধারণ দেখে আমার কিন্তু মনে মনে ভারি সন্দ হয়, যাই বল। ঝোপে ঝাড়ে এমন পা টিপে টিপে লোক কিন্তু পরের পরিবারেরই পিছু নেয়। নিজের পরিবারকে তো ঘরেই পাওয়া যায়। তার জন্যে আর ঝোপে জঙ্গলে আসতে হবে কেন।'

তখন ভরতও বেশ সরল উত্তর দিত এসব কথার, বলত, 'হুঁ, আসল কথা তাহলে খুলে বল সিন্দুর। কেবল আপন আপন পুরুষই নয়, দু' চারজন পর-পুরুষও তাহলে এর আগে তোর পিছু নিয়েছে। না হলে এত কথা জানলি কি করে, কি করে টের পেলি তাদের ধরণ ধারণ।'

সিন্দুর জবাব দিত, 'নিয়েছেই তো, কতবার নিয়েছে। ঘরের বাইরে এসে আপন পুরুষ যখন এমন ফাষ্টিনষ্টি করে, তখন তার ধরণ ধারণ কি আর আপন পুরুষের মত থাকে? তখন পর-পুরুষ হয়েই আনন্দ।' সিন্দুরের কথার কৌশল দেখে অবাক হয়ে রয়েছে ভরত, কিন্তু মনে মনে তার কথার রস ভারি উপভোগ করেছে। কেবল মুখই সুন্দর নয় সিন্দুরের, সে মুখের কথাগুলিও ভারি মধুর, রসে ভরা।

কিন্তু সিন্দুরের আজকের কথাগুলি ভরতের মনে মোটেই এখন রস সঞ্চার করল না। ভার নামল না মুখের, হাল্কা হল না বুক। কিন্তু সিন্দুর যেন নিজের আনন্দেই নিজে বিভোর। নিজের রসিকতার জের টেনে বলতে লাগল, 'মেয়েমানুষের পিছু পিছু হাঁটা অত সোজা কাজ তো নয়। কেবল জোয়ান মরদ হলেই হয় না এ তো কেবল গায়ের জোরের কাজ নয়, ধৈর্য থাকা চাই মনের।'

ভরত স্ত্রীর মুখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল। মুকুন্দমালীর কথার মধ্যে সত্যিই কি কোন মাথা-মুণ্ডু আছে? মনের মধ্যে পাপ থাকলে কোন স্ত্রী কি স্বামীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে এমন হেসে কথা বলতে পারে? এমন ঠাট্টা তামাসা করতে পারে আগের মত? কিন্তু মেয়েমানুষ একবার যদি বজ্জাত হয়, সে না পারে এমন কাজ নেই। শুকচাঁদের উদাহরণগুলি মনে পড়ল ভরতের: 'ভাল জিনিস যখন খারাপ হয় তখন আর একটু-আধটু খারাপ হয় না ভরত। কড়াতে দুধ যদি একটু ধরে যায় তাহলে তা আর মুখে দেওয়া যায় না, ঘি একবার কটু হয়ে গেলে কার সাধ্য তা নাকের কাছে নেয়? মেয়েমানুষও তাই। অমনিতে বেশ ভাল, আদর করবে সোহাগ করবে, শুকনো চুল দিয়ে ভিজে পা মুছিয়ে দেবে, এমন শান্তির জায়গা আর নেই দুনিয়ায়, কিন্তু একবার যদি নষ্ট দুষ্ট হল তো একেবারে সাংঘাতিক, হাসতে হাসতে ভাতে বিষ পর্যন্ত মিশিয়ে দিতে পারে।'

ভরত বলেছিল, 'দূর, যত সব বাজে কথা তোর।' কিন্তু সিন্দুরকে হাসতে দেখে ভরতের মন একবার নিশ্চিন্ত হতে চাইল আর একবার দ্বিগুণ করে সন্দিগ্ধ হয়ে উঠল। এ হাসি কিসের একি সেই আগের সহজ সরল হাসি না কি ভাতে বিষ মিশিয়ে দেওয়ার আগের ছলাকলা? হঠাৎ পরনের রঙীন শাড়িখানার দিকে আর একবার চোখ পড়ল ভারতের। বুকের ভেতরটা ধক করে উঠল। ভরত বলল, 'সিন্দুর, এ শাড়ি তুই পেলি কোথায়?'

কথার ভঙ্গি দেখে সিন্দুরও যেন একটু চমকে উঠল, কিন্তু চমকানিটাকে তেমন আমল না দিয়ে বলল, 'পেলাম এক জায়গায়। তুমি তো আর এনে দাও নি হাতে করে। কিন্তু মানিয়েছে কি না বল।'

ভরত অদ্ভুত একটু হাসল, 'কেশব ভুঁইমালীকে পাশে নিয়ে দাঁড়ালে বোধ হয় আরও ভাল মানাত সিন্দুর।'

সিন্দুর খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বলল, 'কি যা তা বকছ? কেশব ভুঁইমালী আবার এল কোথেকে এর মধ্যে?'

ভরত বলল, 'আমিও তো তাই জিজ্ঞেস করছি। কোত্থেকে এল। এ শাড়ি তুই পেলি কোথায়।'

সিন্দুর তীক্ষ্নস্বরে বলল, 'ছিরি দেখ কথার! কোথায় পেলি! পাব আবার কোথায়। আমার কি সতেরগণ্ডা শ্বশুর আছে যে তারা এনে দেবে? দিয়েছে আমার বাবায়, পেয়েছি আমার বাবার কাছ থেকে।'

ভরত বলল, 'ঠিক তো? না কেশব এনে সাধ করে পরিয়েছে। সত্যি করে বলিস সিন্দুর। মিথ্যে বলে রেহাই পাবি না আমার কাছে। কিছুই শেষ পর্যন্ত আমার কাছে লুকানো থাকবে না।'

সিন্দুর এবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে স্বামীর মুখের দিকে তাকাল, বলল, 'খবরদার, অমন করে চোখ রাঙায়োনা আমার ওপর। কারও চোখ রাঙানির কারও অকথা কুকথা শুনবার ধার ধারি না, তেমন বাপের ঝি নই আমি।'

ভরত মুখ ভেংচিয়ে বলল, 'ঈস্, খুব যে বাপ সোহাগী মেয়ে হয়েছিস এই ক'দিনের মধ্যে? আচ্ছা, আমি তোর সেই বুড়ো বদমাস বাপকে ডেকেই জিজ্ঞেস করছি। সংসারে আমি কাউকে ডরাই ভেবেছিস নাকি?'

লাফ দিয়ে ভরত বেরিয়ে এল ঘর থেকে তারপর প্রায় আর এক লাফে ঢুকল গিয়ে পূবের পোতার গগনের ঘরে। জামাইকে দেখে তাড়াতাড়ি এক কপাল ঘোমটা টেনে দিল লক্ষ্মী। তারপর একখানা পিঁড়ি এনে পেতে দিল বসতে। গগন খেতে বসেছিল। ডাল দিয়ে মোছা মোছা আঁটা আঁটা করে মাখা ভাতের বড় বড় গ্রাস তুলে দিচ্ছিল মুখে। ভরতকে দেখে একটা গ্রাস তাড়াতাড়ি গিলে ফেলে বলল, 'এস বাবাজী, এস।'

ভরত ভ্রূকুঞ্চিত করে শ্বশুরের দিকে তাকাল। এমন সমাদর করে কথা বলবার ধরণ গগনের নয়। বছর কয়েক আগে এধরনের আদরযত্ন ছিল। ইদানীং আর নেই। অনেকদিন ধরে বনিবনাও নেই দুজনের মধ্যে। বাঁশের ভাগ, গাছের ভাগ নিয়ে মন কষাকষি লেগেই আছে। পারতপক্ষে ভরতও কথা বলে না শ্বশুরের সঙ্গে, গগনও তত্ত্বতালাস নেয় না। বরং গগন এখন তাকে বাড়ির ওপর থেকে তুলে দিতে পারলেই বাঁচে। দুজনের মধ্যে সম্বন্ধটা প্রায় সরিকী সম্পর্কে এসে পৌছেছে, শ্বশুর-জামাইয়ের ভাব আর নেই। তাছাড়া ভরত কিছু দেরি করেই এসেছে। গগনের বিয়ের বায়নার তাতে ক্ষতি

হওয়ারই কথা। তার জন্যে নিন্দা-মন্দই তো প্রাপ্য ভরতের। তা না করে গগন এত আদর-সোহাগ জানাচ্ছে কেন। নিশ্চয়ই তলে তলে কোন ব্যাপার ঘটেছে। নিশ্চয়ই গুরুতর রকমের কোন অপরাধ করে ফেলেছে গগন ঢুলী। না হলে তার গলা তো এমন নরম, এমন মিষ্টি-মধুর হওয়ার কথা নয়।

শ্বশুরের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আর একবার তাকিয়ে নিয়ে ভরত বলল, 'না বসব না, দুপুর গড়িয়ে গেছে তেল মাথায় দিয়ে নাইতে যাব এবার—'

গগন বলল, 'ঠিক ঠিক। বেলা কি আর আছে নাকি? যাও নেয়ে ধুয়ে খেয়ে নাও।' তারপর লক্ষ্মীর দিকে ফিরে তাকাল গগন, 'নন্দর মা, তেল গামছা দাও জামাইকে।'

ভরত বাধা দিয়ে বলল, 'থাক্ থাক্। তেল গামছা আমার ঘরেই আছে। তোমার কাছে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

গগন পিতলের গ্লাসটি থেকে এক ঢোক জল খেয়ে নিয়ে বলল, 'কি কথা!'

ভরত বলল, 'সানাই বাজাবার জন্যে কেশব ভুঁইমালীকে তুমি ডেকে নিয়ে গিয়েছিলে?'

গগন কৈফিয়তের স্বরে বলল, 'কি আর করব বল। তুমি ঠিক সময়মত এসে পৌছলে না, এ-গ্রাম ও-গ্রাম ঘোরাঘুরি করলাম, পেলাম না কোন সানাইদারকে—'

ভরত রূঢ় কর্কশ স্বরে বলল, 'তাই বলে আমার হাতের সানাই, আমার মুখের সানাই একটা অন্‌জাত, একটা গাঁজাখোর, বেল্লিক বদমাসের হাতে তুলে দিলে তুমি কার কথায়, কোন সাহসে, কার হুকুমে? আমার সানাইতে কেন সে মুখ দিল শুনি, কেন সে আমার সানাই এঁটো করল?'

গগন মুহূর্তকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল ভরতের দিকে তারপর ক্রুদ্ধ স্বরে বলল, 'কি মাথা খারাপের মত কথা বলছিস তুই। সানাই আবার এঁটো হয় নাকি? তাছাড়া সানাই যেমন নিয়েছি, তেমনি তার ভাড়া বাবদ একটা টাকাও তো তুলে দিয়েছি সিন্দুরকে। একজনের সানাই নিয়ে দরকার হলে কতজনে বাজায় তাতে দোষ আছে নাকি কিছু?'

ভরত চেঁচিয়ে বলল, 'না দোষ আবার কিসের, একজনের সানাই নিয়ে আর একজনে বাজায়, দরকার হলে একজনের পরিবারকেও আর একজনের হাতে তুলে দেওয়া যায়। তাতে সানাইও এঁটো হয় না, পরিবারেরও জাত যায় না। টাকা আর শাড়ি গয়না পেলে সবই বজায় থাকে, না?'

ভাতের থালা ফেলে লাফিয়ে উঠল গগন-ঢুলী, চেঁচিয়ে বলল, 'খবরদার, আমার ঘরের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমাকে যা খুশি তাই শুনিয়ে যাবি এত বড় আস্পর্ধা হয়েছে তোর? খুন, একেবারে খুন করে ফেলব। মেয়ে না হয় বিধবা হয়ে থাকবে আমার।'

ভরত বলল, 'বিধবা হবে কেন, তার কেশব ভুঁইমালী থাকবে।'

গগন খানিকটা বিমূঢ় হয়ে থেকে বলল, 'এসব কথা তুই শুনলি কোথায়। এসব বাজে কথা, মিথ্যা কথা, আসবার সঙ্গে সঙ্গেই কে রটিয়েছে তোর কাছে? তার নাম আমি শুনতে চাই।'

ভরত বলল, 'তার আগে আমিও জানতে চাই তোমার মেয়েকে ও বাহারের শাড়ি এনে দিল কে।'

'আমি এনে দিয়েছি হাতে করে, তাতে কি দোষ হয়েছে শুনি।'

ভরত বলল, 'না, দোষ তোমাদের কিছুতেই হয় না। ওই শাড়ি আসবার সময় কেশবই মাথায় জড়িয়ে এনেছিল, সানাই বাজিয়ে ওই শাড়ি সে-ই পুরস্কার পেয়েছিল, এসব সত্যি?'

সিন্দুর দোরের কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিছন থেকে সব শুনছিল। এতক্ষণে তার ধৈর্যচ্যুতি হল। ভরতের কথার জবাবে গগন কিছু বলবার আগেই সিন্দুর পিছন থেকে সামনে এসে দাঁড়াল, তারপর স্বামীর মুখের ওপর চেঁচিয়ে জবাব দিল, 'হ্যাঁ সব সত্যি। কেশবই এই শাড়ি মাথায় করে জড়িয়ে এনেছে, সে-ই পুরস্কার পেয়েছে, তারপর সে-ই এসে ভালবেসে সোহাগ করে আমাকে পরিয়ে দিয়ে গেছে এই শাড়ি। তুমি যা ভেবেছ তার এক বর্ণও মিথ্যে নয়, সব সত্যি, সব সত্যি, হল তো? বল এবার কি বলবে, কর এবার কি করবে।'

রাগে মুখ চোখ ফেটে পড়ছে সিন্দুরের। দুটো চোখ দিয়ে যেন আগুনের ফুলকি ছিটকে বেরুচ্ছে। নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে।

ভরত, গগন, লক্ষ্মী সবাই তার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে রইল। তারপর গগনই কথা বলল প্রথম, ধমক দিল মেয়েকে, 'হারামজাদী বড় বাড় বেড়েছে দেখি তোর, পুরুষে পুরুষে কথা হচ্ছে তুই আবার এলি কেন এর মধ্যে, কে তোকে ডেকে আনল শুনি।'

লক্ষ্মী এগিয়ে এসে হাত ধরল সিন্দুরের, ঘোমটার ভিতর থেকে চাপা কিন্তু শান্ত আর তিরস্কারের সুরে বলল, 'ছি ছি ছি, তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে

গেল মেয়ে। এই সব কথা মুখ দিয়ে বেরোয় কারও। তুমি এস আমার সঙ্গে। আমরা এখন যাই এ ঘর থেকে।'

সিন্দুর হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝঙ্কার দিয়ে উঠল, 'হ্যাঁ, আমরা এখন যাই, আর এরা খুনোখুনি মারামারি করে মরুক। ভারি ভাল মানুষের মেয়ে এসেছে আমার।'

ভরত একবার স্ত্রীর দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকাল, তারপর বলল, 'না, যা শুনলুম, তারপর আর খুনোখুনি, মারামারির সাধ আমার নেই।'

ধীরে ধীরে ভরত গগনের ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সিন্দুর আড়চোখে একবার তাকাল স্বামীর দিকে, কোন কথা বলল না। কিন্তু গগনের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়েও ঢুকল না ভরত, উঠান ছাড়িয়ে একেবারে নেমে পড়ল পথে।

লক্ষ্মী ফিসফিস করে বলল, 'ওমা জামাই রাগ করে চলল কোথায় এই দুপুর বেলা, মুখপুড়ী এবার গিয়ে ডাক, শিগগির গিয়ে ডেকে নিয়ে আয়।'

সিন্দুর মুখ ঘুরিয়ে জবাব দিল, 'দায় পড়েছে, এত যদি দরদ থাকে তুমি যাও, তুমি গিয়ে ডেকে আন।'

লক্ষ্মী এবার স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলে যে। ভর দুপুর বেলায় একটা লোক না খেয়ে-দেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল—'

গগন মুখ খিঁচিয়ে উঠল স্ত্রীকে, 'বেরিয়ে গেল তো আমি কি করব। আমি করব কি শুনি। আমি কাউকে যেতেও বলি নি, সেধে-ভজে আনতেও পারব না। মান-সম্মান সকলেরই আছে।'

এঁটো হাত মুখ ধুয়ে গগন গিয়ে তামাক সাজতে বসল। সিন্দুর একবার তাকাল বাপের মুখের দিকে তারপর ঝাঁপ ঠেলে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ভিতরটা যেমনই হোক মাধবদাসের আখড়ার বাইরের দিকটা ভারি সুন্দর আর সাজানো-গোছানো। দেখতে দিব্যি একটা কুঞ্জ বলেই মনে হয়। চারিদিকটি বেড়াচিতার গাছ দিয়ে ঘেরা। বাঁশের বাখারীর দোর আছে সামনে। বেড়ার গা ঘেঁষে ভিতর দিকে রঙ-বেরঙের ফুলের চারা লাগিয়েছে মাধবদাস। শীত গ্রীষ্ম কোন ঋতুতেই আঙিনায় ফুলের অভাব নেই। ছোট

উঠান, ঘরদোর সব একেবারে ধোয়া-মোছা, ঝকঝকে তকতকে। শনের চালার নিচে দাওয়াটুকু ভারি ঠাণ্ডা। দারুণ গ্রীষ্মের দুপুরেও গা একবার এলিয়ে দিলে মিনিট কয়েক যেতে না যেতে ঘুমে চোখ ভেঙে আসে। খেয়ে-দেয়ে গাঁজায় একবার দম দিয়ে নিয়ে টান টান হয়ে ঘুমচ্ছিল মাধবদাস কিন্তু তার পাশে শুয়ে কেশবের কিছুতেই ঘুম আসছিল না। মাধবের সেবাদাসী রাসেশ্বরীরও দিনে ঘুমাবার অভ্যাস নেই। বৈরাগীর সংসার। ছেলেপুলে কিছু নেই। তবু যেন কাজ করে কূল পায় না রাসেশ্বরী, দু'হাত সব সময়ই তার আটকা। বয়স চল্লিশ ছুঁই ছুঁই করছে কিন্তু চোখ মুখ কি দেহের গড়ন দেখে তা বোঝবার জো নেই। বেশ ভরাট মুখ, ভাসা ভাসা বড় বড় চোখ আর শক্ত আঁটসাঁট মজবুত গড়ন রাসেশ্বরীর। রঙটি অবশ্য কালো। কিন্তু কালো রং ছাড়া আর কোন রঙই যেন রাসেশ্বরীর মানাত না। ফিকে আর ফ্যাকাসে ফ্যাকাসে লাগত। কালো রঙ কালো জলের মত রাসেশ্বরীর হৃদয় মনকে আড়াল করে রহস্যময় করে রেখেছে। পাড়ায় সুনাম নেই রাসেশ্বরীর। আড়ালে-আবডালে ইসারা-ইঙ্গিতে নানা জনে নানা কথা বলে। কিন্তু সামনাসামনি কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না। ছেলে-ছোকরারা, মাধবদাসের ভক্ত শিষ্যরা বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তাড়া খায়। মাধবদাস মুখ টিপে টিপে হাসে আর কলকেতে গাঁজা টেপে।

রাইগঞ্জ থেকে কেনা নতুন পাটি আছে ঘরে তবু কতকগুলি খেজুরের পাতা নিয়ে চাটাই বুনতে বসেছিল রাসেশ্বরী। কাঁথা সেলাই আর চাটাই বোনায় তার ভারি সখ। পুরোনো কাপড়ের অভাবে কাঁথা সেলাই আর ইদানীং তেমন হয়ে ওঠে না কিন্তু চাটাই আর ডালা চালুনী বোনায় রাসেশ্বরীর হাতের যেন বিরাম নেই।

চাটাই বুনতে বুনতে এক ফাঁকে ঘর থেকে দাওয়ায় নেমে এল রাসেশ্বরী, তারপর কেশবের মাথার কাছে এসে বলল, 'কি গো ছোট বৈরাগী, উঠি উঠি করে উঠলে না যে। আর দেরি করো না। যাও উঠে পড়ো। ভুঁইমালীদের কেউ এসে দেখলে জাতে যেটুকু টেনে তুলেছিল সেটুকু ফের ঠেলে নামাবে।'

কেশব বলল, 'নামাক, তাতে তোমার কি। তুমি তো আর হাত ধরে টেনে তুলতে যাবে না।'

রাসেশ্বরী হাসল, 'আমি হাত ধরলে কি আর কোন কালে কুলে উঠতে পারতে। একেবারে অকুল দরিয়ায় নাকানি-চুবানী খেতে। তার চেয়ে এই

বেশ আছ। তবু কোন না কোন দিন ভরসা আছে কুলে ওঠবার। তাই ওঠো, উঠে রোদে রোদে বরং ঘুরে বেড়াও গিয়ে। ঘুম তোমার আজ আর আসবে না ছোট বৈরাগী।'

কেশব বলল, 'কেন, ঘুম আসবে না কিসে বুঝলে।'

রাসেশ্বরী বলল, 'চোখ দেখেই বুঝতে পারছি। সিন্দুরের ছিটায় কর কর করছে চোখ মুখ, ও চোখে ঘুম আসবে কি করে। যাও, উঠে ভাল করে ধুয়ে মুছে এস গিয়ে, তবে যদি শান্তি পাও।'

পানের পিক ফেলে হাসতে হাসতে রাসেশ্বরী আবার গিয়ে ঘরে ঢুকল।

কেশব অবাক হয়ে ভাবল সিন্দুরের কথা তাহলে এরই মধ্যে রাসেশ্বরীরও কানে গেছে। মেয়েদের চোখ কান ভারি সজাগ এসব ব্যাপারে। কেশবের সেই পুরস্কার পাওয়া শাড়ি পরে নাকি ঘাটে গিয়েছিল সিন্দুর। তা নিয়ে অনেকেই গা টেপাটেপি চোখ টেপাটেপি করেছে। কিন্তু এ ব্যাপার নিয়ে একটা হৈচৈ হোক তা পছন্দ নয় কেশবের। মনে মনে তার আর সিন্দুরের পরস্পরের উপর একটু টান যদি থাকে তো থাক কিন্তু ভুঁইমালী পাড়ার মানও তাকে রাখতে হবে।

সেদিন অশ্বিনী ভুঁইমালী খুব সাবধান করে দিয়েছে তাকে। বলেছে, 'মনে রাখিস ভুঁইমালী পাড়ার মান তোর হাতে। কোন অকর্ম কুকর্ম করলে তাতে কেবল তোরই কান কাটা যাবে না, আমাদের মান-সম্মান নিয়েও টান পড়বে। বুঝেছিস? কানে গেল তো কথাটা?'

কেশব ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছে, 'হুঁ।'

অশ্বিনী মুরুব্বীর সুরে বলেছে, 'হুঁ নয়। এখন থেকে ওসব বদচাল বেচাল ছাড়। গাঁজা দু'এক ছিলিম খাস খা কিন্তু ঢুলী পাড়ায় আর বৈরাগীর আখড়ায় দিনরাত অমন করে গড়িয়ে গড়িয়ে বেড়াতে পারবি নে। খাটখোট কাজ-কর্ম কর, আর পাঁচজনে যেভাবে থাকে, সেইভাবে থাক। মতিগতি যদি ফেরে চাঁদের কান্দি থেকে সমাজের মেয়ে এনে তোকে বিয়ে করাব আমি, বাবুদের বলে ঘর বাঁধবার ভিটা ঠিক করে দেব।'

বিস্ময়ে গর্বে অবাক হয়েছে কেশব, সহজে কথা বলতে পারে নি। তারও যে জাত-মান আছে, সেও যে সমাজের একজন, একথা এতদিন যেন তার হুঁসই ছিল না। গাঁয়ের ভুঁইমালীদেরই কি ছিল? ঢুলী পাড়ায়, মাধবদাসের আখড়ায় দিন-রাত সে পড়ে রয়েছে, কই কেউ তো তাকে এর আগে কোনদিন

ডেকেও একবার জিজ্ঞেস করে নি। সেজন্যে কেশবের নিজেরও যে বিশেষ আফসোস ছিল তা নয়, কিন্তু সেদিন গগন ঢুলীর দলের সঙ্গে সানাই বাজিয়ে হঠাৎ যেন তার জাত সম্বন্ধে সকলের খেয়াল হয়েছে। জাত হারাতে গিয়ে একরকম হারিয়ে এসে সে জাতে ওঠবার সুবিধা পেয়েছে। অশ্বিনী আর তার ভাই নিকুঞ্জ তাকে বার বার করে বলে দিয়েছে সে যদি ভাল হয়ে চলে কাজ-কর্ম, রোজগার-পত্রের চেষ্টা দেখে তাহলে চাঁদের কান্দি থেকে সমাজের চাঁদপানা মেয়ে এনে বিয়ে দেবে কেশবের সঙ্গে। কুণ্ডুকর্তাদের ধরে পড়ে ঘর বাঁধবার ভিটা চেয়ে দেবে তার জন্যে। এতকাল যাই করুক শত হলেও ভুঁইমালীদের ছেলে তো কেশব। তাকে তারা এমন করে বয়ে যেতে, নষ্ট হয়ে যেতে দিতে পারে না। শুনতে শুনতে এক অপ্রকাশ্য মমতায় বাক্‌রোধ হয়ে এসেছে, কেশবের ছলছল করে উঠেছে চোখ। অশ্বিনীর মধ্যে, কার্তিকের মধ্যে তাদের বাবা মোড়ল জ্যেঠার মধ্যে এতসব আত্মীয়-স্বজন লুকিয়ে ছিল কি করে। কেন এতকাল তাদের চোখে পড়ে নি, কেন তাদের চিনতে পারে নি কেশব?

কিন্তু কুলে টেনে নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভুঁইমালীরা তাকে সাবধান সতর্কও কম করে দেয় নি। ঢুলীদের সঙ্গে অত মাখামাখি চলবে না কেশবের। একটু বেশি ঘেঁষা-ঘেঁষি করতে গিয়েই ভুঁইমালীরা এখন সাহস বাড়িয়ে দিয়েছে, স্পর্ধা বাড়িয়ে দিয়েছে ঢুলীদের। নাহলে কোথায় ঋষি ঢুলী—নোংরা চামড়া নিয়ে কারবার যাদের তারা নাকি সাহস পায় ভুঁইমালীদের সঙ্গে বোঝা-পড়া করতে, মুখোমুখী সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে কথা কাটাকাটি করতে, মাথাপাগলা কেশবকে ভুলিয়ে নিয়ে তাকে দিয়ে সানাইদারের কাজ করিয়ে নিতে। ভুঁইমালীরা অত বেশি মেশামেশি ঘেঁষা-ঘেঁষি করেই কাঁধে চড়িয়েছে ঢুলীদের। ঢুলীরা ঢোল কাঁধে করেই খালাস। আর ভুঁইমালীরা নিজেদের বোকামীতে সেই ঢুলীদের সুদ্ধু কাঁধে চাপিয়েছে। কুণ্ডুকর্তারা দু'তিন দিন বাদে বিচারের বৈঠক বসাবেন বলেছেন। দেখা যাক সত্যি সত্যিই প্রতিকার তাঁরা করেন কিনা, সুবিচার করেন কিনা নাহলে ভুঁইমালীরা নিজেদের হাতেই এর বিচারের ভার নেবে। কিন্তু ততদিন কেশব যেন একটু ফাঁকে ফাঁকে থাকে। যেন ফের না জড়ায় ঢুলীদের সঙ্গে। ভুঁইমালীদের সমাজে সিন্দুরের চেয়েও ঢের সুন্দরী মেয়ে আছে।

কেশব অবাক হয়ে বলেছিল, 'এর মধ্যে আবার সিন্দুরকে টানছে কেন।'

বুড়োরা পরস্পরের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে হাসি গোপন করতে করতে বলেছিল, 'থাক থাক, ওসব কথায় আর দরকার নেই। ছোঁড়া লজ্জা পেয়েছে। গাঁজাই টানুক আর যাই টানুক লাজলজ্জা সকলেরই আছে। তা বাপু স্বভাব-চরিত্তির ভাল কর, মতি বুদ্ধি স্থির কর কাজকর্মে মন দাও, বিয়ের ভাবনা কি তোমার। সুন্দর মেয়ের অভাব কি, ডাগর হলে সব মেয়েকেই সুন্দরী দেখায়। পরের এঁটো পাতায় ছিঁটে ফোঁটায় পেটও ভরে না, মনও ভরে না, তাতে লাভ কি! আর শত হলেও অন্ত্যজাত তো, হাতের জল ছোঁয় না ভদ্দরলোকে। ছিঃ ছিঃ।'

কার্তিক কেশবের সমবয়সী। তাকে একান্তে ডেকে নিয়ে কেশব জিজ্ঞাসা করেছিল, ঠেস দিয়ে ঠেস দিয়ে মোড়ল মাতব্বররা কি সব বলছিল কার্তিক। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

কার্তিক ধূর্তের মত হেসেছিল, 'তা বুঝবি কেন। নাক টিপলে এখনও দুধ বেরোয় যে। বাবারে, ডুবে ডুবে জল খাও আর ভাবো যে কাকপক্ষীটিও জানতে পারে না। কিন্তু কাকপক্ষী না জানলে কি হবে পাড়া-পড়শীর জানতে কিছুই বাকি থাকে না।' কেশবের দিকে তাকিয়ে আবার একটু মুখ টিপে হেসেছিল কার্তিক, 'তবে যাই বলি, তোর পছন্দের তারিফ করতে হয় কেশব। সিন্দুর কেবল ও পাড়ার মধ্যে কেন, এ পাড়ার মধ্যেও তার জুড়ি নেই। মেয়ে ঢুলীদের বটে, কিন্তু যেন পটের ওপর তুলি দিয়ে আঁকা। কি দিয়ে বশ করলি বল্ দেখি, আমরা তো একটু কাছে গেলেই একেবারে ফোঁস করে উঠত।'

বিস্ময়ে খানিকক্ষণ হতবাক্ হয়ে ছিল কেশব তারপর প্রায় ধমকের সুরেই বলেছিল, 'ছিঃ, এসব তোরা পেলি কোথায়? বেচারা সিন্দুরকে নিয়ে কেন তোরা এমন মিছিমিছি টানাটানি শুরু করলি বল দেখি। তার কি দোষ।'

কার্তিক পরম কৌতুকে এক চোখ বন্ধ করে তাকিয়েছিল কেশবের দিকে, 'তা তো ঠিকই। তার আর কি দোষ, তারও দোষ নেই, তোমারও দোষ নেই। সব একেবারে গুণের কারবার। তুমি হলে গুণধর, আর তিনি হলেন গুণমণি, যত দোষ কেবল পাড়া-পড়শীর, যত দোষ কেবল তাদের চোখ কানের।'

এরপর কেশব আর কার্তিককে থামাতে চেষ্টা করে নি, প্রতিবাদ করতে যায় নি তার কোন কথার। কেশবের কান থেকে বিড়ি তুলে নিয়ে দেশলাই জেলে ধরিয়ে টানতে টানতে আরও কত বকবক করেছে কার্তিক, 'কে জানে

এত গুণ এত রস তোমার ছোট কলকের, তাহলে আমরা কি আর জীবনভর বড় কলকে টানি আর ঘরে অরুচি হলে বুড়ী ধাড়ীর কাছে গিয়ে মুখ বদলাই ?'

কেশব কোন জবাব দেয় নি। কান পেতে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল শুনেছে? তারপর কার্তিক যখন কামলা খাটতে গিয়েছে কেশব পা টিপে টিপে এসেছে মাধব বৈরাগীর আখড়ায়। একটু দম দিয়ে না নিতে পারলে সে দম ফেটে মরে যাবে। যত সব মিথ্যা বানানো কথা। এসব কথা কোনদিন ভাবেও নি কেশব। লোকে কলঙ্ক ছড়াচ্ছে তার নামে, তবু শুনতে নিতান্ত মন্দ লাগছে না। দাসী পাঁচী বাতাসী নয়, স্বয়ং সিন্দুরের নামের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে তার নাম। কলঙ্ক যদি তাকে ছুঁয়েই থাকে এবার তার কলঙ্ক নয়, চাঁদের কলঙ্ক, এসব কথা নিশ্চয়ই কানে গেছে সিন্দুরের। এই মিথ্যা অপযশ অপবাদ শুনে সেই বা কি ভাবছে, কি চিন্তা করছে, একবার অনুমান করতে চেষ্টা করল কেশব। গাঁজা খায়, মাধবদাসের আড্ডায় পড়ে থাকে, জোয়ান পুরুষ হয়েও কোন কাজকর্ম করে না বলে সিন্দুর তাকে চিরকাল ঠাট্টা তামাসাই করে এসেছে। বলেছে অকর্মার ধাড়ি, বলেছে মাধবদাসের বোষ্টমী যখন দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে তখন যাবে কার বাড়ি। কিন্তু সিন্দুর যেন কেবল তামাসাই করে গেছে কেশবকে। গালমন্দ করে নি, খোঁচা দেয় নি, জ্বালা ছিল না তার জিভে। ভাবভঙ্গি দেখে মনে হয়েছে যেন সিন্দুরের ঠাট্টা-তামাসা করার জন্যে কেশবের মত অমনি একজন অকর্মা বয়ে যাওয়া পুরুষের গাঁয়ে থাকা নিতান্তই দরকার। করিৎকর্মা কত লোকই তো আছে পাড়ায় তাদের দেখে তো কৌতুকের হাসি ফোটে না সিন্দুরের মুখে, ছোট-বৈরাগী বলে ডাকতে তো সাধ যায় না সিন্দুরের তাদের কাউকে দেখে, সিন্দুরের সেই সাধ মেটাবার জন্যেই যেন কেশব রয়েছে, কেশবের না থাকলে চলে নি।

কিন্তু এমন ঠাট্টা-তামাসার পাত্রের সঙ্গে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করবার মত মানুষের সঙ্গে লোকে যখন তার নাম গিঁট দিয়ে দিয়েছে তখন মুখের ভাবখানা কেমন হয়েছে সিন্দুরের, কেমন হয়েছে তার মনের ভাবখানা দেখতে ভারি ইচ্ছা করতে লাগল কেশবের। সিন্দুরের মুখ কি রাগে আগুনের মত টকটক করছে না লজ্জায় নরম গোলাপী রঙের তুলি পড়েছে তার মুখে। না কি রাগও নয়, লজ্জাও নয়, ঘৃণা নয়, তাচ্ছিল্যও নয়, সেই আগেকার মতই তামাসার হাসি

ফুটে রয়েছে সিন্দুরের মুখে। সেই মুখখানা দেখবার ভারি সাধ জাগতে লাগল কেশবের। কিন্তু মুখোমুখী দাঁড়াবার সাহস হল না। কি জানি কি দেখতে কি দেখবে তাছাড়া মুখ দেখলেই কি কোন মেয়ের মন দেখা যায়? বিশেষ করে সিন্দুরের মত মেয়ের? বদনাম তো রাসেশ্বরীর সঙ্গেও তার এক সময় রটেছিল। সে বদনামটি এখনও একেবারে ধুয়ে মুছে যায় নি। কিন্তু কেবল সেই মিথ্যা বদনামের ওপর ভর করে কি এগুনো যায় নির্ভর করবার মত যদি আর কোন হদিস ইসারা না থাকে? রাসেশ্বরী কেবল ঠাট্টা-তামাসা করেই সেই বদনামকে উড়িয়ে দিয়েছে, কাছে ঘেঁষতে দেয় নি, ঘাটে ভিড়তে দেয় নি। ঘাটে ভিড়বার জন্যে কেশবেরও তেমন গরজ ছিল না। বয়সে আর বুদ্ধিতে তার চেয়ে অনেক বড় রাসেশ্বরী।- অকূল দরিয়ার মতই। সে দরিয়ায় ঝাঁপ দিতে গিয়ে বুক কাঁপে, মুখে ঠাট্টা-তামাসা করলেও মনে মনে তাকে ভারি ভয় করে কেশব। আর ঠাট্টা-তামাসার ভিতর দিয়ে রাসেশ্বরী তাকে যে অভয় আর আস্কারা দেয় সে আস্কারা স্নেহের। হাসতে হাসতে তার পিঠে হাত বুলোয় রাসেশ্বরী। তাতে রক্ত গরম হয় না, সমস্ত চাঞ্চল্য ঠাণ্ডা হয়ে যায়। পাখির ছানার মত বিড়াল ছানার মত কেশবকে আদর করে রাসেশ্বরী। মাধবদাস চেয়ে চেয়ে দেখে, ঠোঁট টিপে গাঁজা টেপে।

কিন্তু সিন্দুরের ছোঁয়ায় সমস্ত মন যেন রাঙা হয়ে উঠতে চাইছে কেশবের। ভারি ভালো লাগছে, ভারি লজ্জা করছে। বিয়ে বাড়ির সেই চেলী চন্দন-পরা কনের মুখের সঙ্গে যে অদ্ভুত মিল সেদিন কেশব লক্ষ্য করেছিল সেই মধুর সাদৃশ্য যেন তার দু'চোখের কোলে কাজলের মত লেগে রয়েছে।

'কেশব আছ নাকি? কেশব!'

ধ্যান ভাঙল, চমক ভাঙল কেশবের। আঙিনার বাইরে থেকে কে ডাকছে তাকে নাম ধরে।

চাটাই বুনতে বুনতে রাসেশ্বরী ঘরের ভিতর থেকে বলল, 'দেখ তো এই ভর দুপুরে কে আবার জ্বালাতে এল।'

পাশে নাক ডেকে ঘুমোচ্ছে মাধবদাস। পা টিপে টিপে আস্তে আস্তে উঠে গেল কেশব। দোরের কাছে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কে।'

রুক্ষ কর্কশ কণ্ঠে জবাব এল, 'বাইরে বেরিয়ে এসে একবার দেখই না কে। কেবল বোষ্টমীর আঁচলের তলা থেকে উঁকিঝুঁকি মারলে কি মানুষ চেনা যায়?'

দোর খুলে সামনে এসে দাঁড়াল কেশব, একটু অবাক হয়ে থেকে বললে, 'ও, ভরত? তা তুমি যে এখানে? কখন এলে? ব্যাপার কি।'

ভরত খপ করে হাতখানা চেপে ধরল কেশবের। ফের যেন আবার আখড়ার মধ্যে গিয়ে না ঢুকতে পারে। তারপরে কেশবের গলার অনুসরণ করে বলল, 'ব্যাপার কি। আমিও তো তাই জানতে এলুম, আমিও তো তাই জিজ্ঞাসা করছি ব্যাপার কি।'

কেশবের মুখটি মুহূর্তের জন্যে ফ্যাকাসে হয়ে গেল, ঢুরু ঢুরু করতে লাগল বুকের মধ্যে, ধরা পড়ে গেছে, সে ধরা পড়ে গেছে। এর মাঝখানে ভরত বলে যে কোন লোক আছে এতক্ষণ তা যেন তার খেয়ালই ছিল না। ভরতের ক্রুদ্ধ আরক্ত চোখের দিকে তাকিয়ে কেশব অস্ফুট স্বরে বলল, 'কোন্ কথা জিজ্ঞেস করছ তুমি, কোন্ ব্যাপারের কথা।'

'হারামজাদা, ন্যাকা নচ্ছার! কোন্ ব্যাপার তুমি জানো না?' হঠাৎ ঠাস করে একটা চড় মেরে বসল ভরত কেশবের গালে, 'একি রাসী বোষ্টমী পেয়েছ, একি মাধব বৈরাগী পেয়েছ, যে যা তা করে রেহাই পাবে। আমি ভরত ঢুলী আর কেউ নয়, তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়ে তবে ছাড়ব।'

পাঁচ আঙুলের দাগ জ্বল জ্বল করছে কেশবের গালে, ফ্যাকাসে মুখখানায় সমস্ত রক্ত ভিড় করে এসেছে, কেশব তবু যেন একটু হাসতে চেষ্টা করে বলল, 'তা ওড়াও, কিন্তু খুলি ওড়ালেই কি সব উড়ে যাবে মনে করেছ?'

'কি, কি বললি! আবার মস্করা করছিস এরপর! এত সাহস, জাত মেরে, ঘর নষ্ট করে আবার মস্করাও করবি তুই আমার সঙ্গে!'

অতর্কিতে এক প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে কেশব পড়ে গেল সামনের গাবের গুঁড়ির ওপর। রাগে, অপমানে এবার সেও উন্মত্ত হয়ে উঠল। ভরত কাছে এগিয়ে আসতে না আসতে কেশব উঠে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল উন্মত্তের মত। কিন্তু লোহার মত শরীর ভরতের, লম্বায় চওড়ায় প্রায় কেশবের দ্বিগুণ তার আকৃতি, শক্তি বোধ হয় আরও কয়েকগুণ বেশি। মুহূর্ত কাটতে না কাটতে মারের চোটে প্রায় অজ্ঞান হয়ে পড়ল কেশব, রক্ত ছুটল মাথা ফেটে। প্রায় নিমেষের মধ্যেই ঘটে গেল কাণ্ডটা।

চিৎকার করতে করতে রাসেশ্বরী ছুটে এল, ছুটে এল মাধবদাস। দুজনে মিলে জোর করে ছাড়িয়ে নিল ভরতকে। গোলমাল শুনে ঢুলীপাড়ার

ভুঁইমালী পাড়ার সবাই এসে মাধবদাসের আঙিনার সামনে ভেঙে পড়ে আরও চিৎকার আর গোলমাল শুরু করে দিল। তারপর সেই ভিড়ের মধ্যে একসময় দেখা গেল সিন্দুরকে, কোন লজ্জা নেই, আতঙ্ক আশঙ্কার আভাস নেই তার মুখে। আরও দশজন ঝি-বউয়ের সঙ্গে সিন্দুরও যেন কেবল তামাসা দেখতেই এসেছে।

দু'দলের মধ্যে রোখারুখি, গালিগালাজ চলতে লাগল খানিকক্ষণ ধরে। ভুঁইমালীরা বলল, 'বেঁধে মারো শালার ঢুলীকে। মেরে হাড় গুঁড়ো করে দাও।'

ঢুলীরা সংখ্যায় অল্প, কিন্তু তাই বলে ভড়কাবার পাত্র নয় তারা। রুখে উঠে তারাও জবাব দিল, 'ঈস্, তুলেই দেখুক না একবার ভরত ঢুলীর গায়ে কেউ হাত, কোন্ শালার ভুঁইমালীর ঘাড়ে কটি মাথা আছে দেখে নিই।'

ভুঁইমালীদের অশ্বিনী তেড়ে আসছিল কিন্তু মোড়ল জলধর ধমক দিয়ে বলল, 'এই থাম। হাতাহাতি মারামারি করতে যাস নে খবরদার।'

ঢুলীদের মাতব্বর গগনও এতক্ষণে এসে পড়েছে। সেও মাঝখানে পড়ে স্বজাতের গোঁয়ার গোবিন্দ ছেলে-ছোকরাগুলিকে থামিয়ে দিল।

কিন্তু মেয়েদের মুখ থামানো অত সহজ নয়। অশ্বিনীর মা গৌরমণি বলল, 'ভরত ঢুলীর আক্কেলকেও বলিহারি যাই বাছা। গায়ে জোর থাকলেই কি মানুষ মানুষকে অমন করে মারে। বেশ তো, বুঝতে চায় সমানে সমানে বুঝুক। কেশবের মত রোগাপটকা একটি ছেলে পেয়ে তুই যে হাতের সুখ উঠিয়ে ছাড়লি, কেন গাঁয়ে কি আর মানুষ ছিল না। আহাহা, কি হালটাই না হয়েছে ছেলেটার।'

ঢুলীদের তরফ থেকে জবাব দিল রামলালের পিসী ক্ষীরোদা, 'আহাহা, কি দরদের, কি সোহাগের কথা গো। অঙ্গ জুড়িয়ে গেল। রোগাপটকা ছোকরা তবে আর কি। ঘরের পরিবারের সঙ্গে ফষ্টিনষ্টি করবে, বিন্দাবনলীলা চালাবে আর পুরুষমানুষ তাকে কাঁধে করে নাচবে, পা ধুয়ে জল খাবে। সে রীতি-নিয়ম ভুঁইমালীদের ঘরে থাকতে পারে, ঢুলীদের ঘরে নেই।'

গগন ধমক দিয়ে বলল, 'এই ক্ষীরী, তোকে বকবক করতে কে বলেছে শুনি, কে ডেকেছে তোকে ওকালতি আমমোক্তারী করতে?'

ওকালতী আমমোক্তারী কথাগুলি তেমন বোধগম্য হল না ক্ষীরোদার কিন্তু গগনের কথার জবাবে সেও মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'ডাকবে আবার কে। এর

আবার ডাকাডাকির কি আছে? তোমার মেয়ের কেলেঙ্কারীর কথা না জানে কে? গোমর রাখতে চাই কিসের?'

কেবল ভুঁইমালীদের ভিতরেই না, ঢুলীদের মেয়েদের মধ্যেও একটা হাসাহাসি গা টেপাটিপি শুরু হল। রামলাল জোর করে সরিয়ে নিয়ে গেল তার পিসীকে।

সবাই ভাবল সিন্দুর এবার চেঁচিয়ে পাড়া মাত করবে। সত্য হোক মিথ্যা হোক এ কলঙ্কের কথা মুখ বুজে সে সহ্য করবে না। কেবল মুখখানাই তো আর সুন্দর নয় সিন্দুরের, মুখের ভিতরের জিভখানাও ধারালো ছুরির মত। কিন্তু সিন্দুর যেমন চুপ করেছিল তেমনি চুপ করেই রইল, দুটি রাঙা পাতলা পাতলা ঠোঁটের একটির সঙ্গে আর একটিকে কে যেন আটা দিয়ে জুড়ে দিয়েছে।

অবাক হয়ে অনেকেই সিন্দুরের দিকে তাকাল। মাথায় আঁচল নেই সিন্দুরের। কালো কোকড়ানো চুলের মাঝখানকার সিঁথিতে দেখা যাচ্ছে মোটা সিঁদুরের দাগ। কপালে সুন্দর একটি গোল ফোঁটা। ঝগড়াটেই হোক আর যাই হোক পাড়ায় এতকাল স্বভাব-চরিত্রের খ্যাতি ছিল সিন্দুরের। কোনদিন তার নামে কোন কলঙ্ক ওঠে নি এর আগে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ওই হ্যাংলা গাঁজাখোর ভুঁইমালী ছোকরাদের সঙ্গেই কি মজে গেল সিন্দুর। কথাটি যেন বিশ্বাস করতে ইচ্ছা হয় না। কিন্তু অবিশ্বাস্যই যদি হবে এ কলঙ্কের সে প্রতিবাদ করল না কেন। যদি ভিতরে কিছু নাই থাকবে একেবারে বাড়ি এসে পৌঁছবার সঙ্গে সঙ্গে ভরত ঢুলীই বা কেন বাঘের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে কেশবের ওপর?

সিন্দুরের নীরবতায় গগন আর ভরতও কম বিস্মিত হল না। এখন হৈ-চৈ হুলস্থুল বিশ্রী ব্যাপারের মধ্যে যখন ছুটেই আসতে পারল সিন্দুর মুখ ফুটে কি একবার সে বলতে পারল না এ সব মিথ্যা, এ সব কলঙ্ক আসলে তার একটুও গায়ে লাগে নি, মনে লাগে নি? খানিক আগে ভরতের কাছে সে যেমন সব স্বীকার করবার ঢঙে অস্বীকার করেছিল তেমনই না হয় করত সিন্দুর। ভরত মনে মনে ভাবল তাতেও তার মান বাঁচত।

গাঁজা খাক আর যাই খাক মাথা দেখা গেল মাধব বৈরাগীরই সব চেয়ে ঠাণ্ডা। ঢুলী আর ভুঁইমালীদের ভিড় ঠেলে সে এগিয়ে এসে বিরক্ত স্বরে বলল, 'চোট পেয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল মানুষটি আর তোমরা কোঁদাকুঁদি রোখারুখি নিয়েই আছ। ডাক্তার কবরেজ ডেকে ওকে আগে সুস্থ করবে,

তাতো নয় নিজেদের জেদ আর বড়াই নিয়েই অস্থির। এস দেখি শিগগির, কেউ এসে ধরো দেখি আমার সঙ্গে কেশবকে।'

এবার যেন সবাইএর নতুন করে চোখ পড়ল কেশবের দিকে। মাথার খানিকটা জায়গা কেটে গিয়ে রক্ত জমে রয়েছে। সিন্দুরের সিঁদুর লেপা সিঁথির মতই যেন দেখা যাচ্ছে অনেকটা। মাধবদাসের কথায় ভুঁইমালীদের জন কয়েক ছোকরা এগিয়ে এল। তাদের ভিতর থেকে কার্তিককেই ডেকে নিল মাধবদাস, বলল, 'তুই আয়, একজনেই হবে।'

মোড়ল জলধরের হুকুমে কার্তিক যাচ্ছিল পাশের গুপী-গাঁ থেকে ডাক্তার ডেকে আনতে, মাধবদাসের বোষ্টমী রাসেশ্বরী বলল, 'থাক থাক, অত দরদে আর কাজ নেই কারো। ডাক্তার কবরেজে আর দরকার নেই। কচি দূর্বা আছে আমার উঠানে, রেড়ীর তেল আছে ঘরে। রক্ত যদি বন্ধ হয় তাতেই হবে। তোমাদের কারো মাথা ঘামাতে হবে না তা নিয়ে। অমন এক-আধটু চোটে কি হয় পুরুষমানুষের।'

মমতায়, অভিমানে, উদ্বেগে মিলে ভারি অদ্ভুত শোনাল রাসেশ্বরীর গলা। ভুঁইমালীদের কেউ কেউ মুখটিপে হাসলও। ভারি বেহায়া মেয়েমানুষ রাসেশ্বরী, মোটেই লাজলজ্জা নেই। জলধর বলল, 'না ডাক্তার ডাকবে না, ভালোমন্দ কিছু একটা হলে বুঝি এসে তুমি দেখবে?'

আধ কপাল পর্যন্ত ঘোমটা টানা রাসেশ্বরীর। তার ভিতর থেকে মৃদু কিন্তু সুস্পষ্ট জবাব এল, 'দেখবই তো। এতকাল কেশবের ভালোমন্দ কে দেখেছে শুনি? সব ভার তো রাসী বোষ্টমীর ওপরই ছিল। তখন তার মাথাও ফাটে নি, রক্তও পড়ে নি। আত্মজনেরা ভালোমন্দের ভার নিয়েছে বলেই তো আজ এই দশা তার।'

রাসেশ্বরী দোর বন্ধ করে দিল আঙিনার।

জলধর মুহূর্তকাল নির্বাক হয়ে থেকে ফটিকের দিকে ফিরে গর্জে উঠল, 'এই হারামজাদা, অমন হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলি কেন? চেয়ে চেয়ে রূপ দেখছিস বুঝি বোষ্টমীর? এসে আবার দেখিস। এখন যা ছুটে গিয়ে ডেকে নিয়ে আয় যোগেন ডাক্তারকে। দোর বন্ধ করলেই হল। ও দোর খুলতে জলা ভুঁইমালীর পুরো একটা লাথিও লাগে না।'

গগন মেয়ের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুইই বা আর দাঁড়িয়ে আছিস কেন। আয় বাড়ি আয়। চলো ভরত বাড়ি চলো।'

জলধর বলল, 'জামাইকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ গগন, যাও। কিন্তু এর একটা নালিশ বিচার না করে ভুঁইমালীরা কিন্তু ছেড়ে দেবে না সে কথা মনে রেখ।'

যাদব রুখে উঠে কি জবাব দিতে যাচ্ছিল গগন তাকে বাধা দিয়ে নরম স্বরে বলল, 'বেশ তাই বেশ, পাঁচজনে মিলে শালিশ দরবারে যে বিধান দেবে তা কি আমি না মেনে পারি। ভরতের মুখ ফুটে বলতে লজ্জা হতে পারে কিন্তু জামাইএর হয়ে আমিই তোমাদের পাঁচজনের কাছে মন খুলে বলছি জলধর। ভরত ভুল বুঝেছে ভরত ভুল করেছে। আর তার ভুলের জন্যে আমি মাপ চাইছি তোমাদের কাছে।'

ভুঁইমালীদের দিকে তাকিয়ে সত্যি সত্যি হাত জোড় করল গগন।

গগনের এতখানি বিনয়ে ভুঁইমালীরা সুদ্ধু অবাক হয়ে গেল। মরে হেঁজে অত্যন্ত অল্প কয়েক ঘরই মাত্র এ গাঁয়ে আছে ঢুলীরা। তবু শত হলেও, একটা জাতের মাতব্বর মানুষ তো গগন। সে মাথা হেঁট করলে একটা গোটা জাতের মাথা হেঁট হয়ে যায়। এ কি ব্যবহার তার, একি বশ্যতা। যাদব, রামলাল, ভরত সবাই উত্তেজিত হয়ে উঠল, 'না না না, এ মাপ কিন্তু আমরা চাইলুম না মাতব্বর, আমরা কিছু দোষ করি নি, যে মাপ চাইব।'

ভরতও ঘাড় ফুলিয়ে বলল, 'মাপ চাইব কার ভয়ে। যা করেছি ঠিক করেছি।'

গগন ভরতের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন রাগে ফেটে পড়ল, 'তবু বলবি ঠিক করেছিস? হতভাগা গোঁয়ার কোথাকার।'

এতক্ষণ বাদে কথা বলল সিন্দুর, স্বামীর হয়ে সেই জবাব দিল বাপকে, 'বলবে না তো কি করবে? জোয়ান-মর্দ পুরুষ না? ভুলই করুক আর যাই হোক জোয়ান পুরুষের রাগ হলে অমন দু'একটা রোগাপটকা লোকের মাথা এক-আধ দিন ফাটে, তাতে কোন দোষ হয় না। চলো ঘরে চলো।' শেষের কথাটি সিন্দুর বলল স্বামীর দিকে তাকিয়ে তারপর একবার রাসেশ্বরীর বন্ধ দরজার দিকে কি একটু চেয়ে দেখল। এই সময় যদি একবার বেরিয়ে আসত রাসেশ্বরী, যদি একবার শুনত তার কথাটা তাহলে যেন মনের ঝালটা মিটত সিন্দুরের, মিটত বুকের জ্বালাটা। সত্যিই কোন লাজলজ্জা নেই রাসেশ্বরীর। থাকবে কেন। মার্কামারা মেয়েমানুষ। বদনামের তো আর কোন ভয় নেই। কিন্তু লজ্জা আর ভয়টি যদি সিন্দুরের নিজেরও আর

খানিকটা কম থাকত তাহলে কি কেশবকে আর রাসেশ্বরীর আঙিনার ভিতরে নিয়ে যেতে দিত সিন্দুর, নিজের ঘরে নিয়েই তুলত নিজেই সেবা আর পরিচর্যা করত কেশবের। লোকে অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে ভাবত, 'মেয়েটা কি বেহায়া, মোটেই ভয় ডর নেই, মোটেই লাজলজ্জা নেই সিন্দুরের।'

ভরত ততক্ষণে এসে স্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়েছে। মুখের দু'তিন জায়গায় তারও ছড়ে গেছে, তবু সে মুখের খুশি খুশি ভাবটা ঢাকা পড়ছে না: ভরত বলল, 'চল সিন্দুর ঘরে চল।'

সিন্দুর চমকে উঠে বলল, 'হ্যাঁ চলো।'

ঢুলী আর ভুঁইমালীদের ভিতরে মন কষাকষি চলছিল অনেকদিন থেকেই। এতদিন বেতের কাজ আর বাঁশের কাজ একচেটিয়া ছিল ঢুলীদের, ভুঁইমালীরা ওসব কাজে হাত দিত না। কিন্তু হাটে বাজারে ধামা কুলো, সাজী-টুরীর দাম বেড়ে যাওয়ায় ভুঁইমালীরাও কেউ কেউ ওসব বুনতে শুরু করেছে। আর দেখা যাচ্ছে ঢুলীদের চেয়ে তাদের হাতের কাজ খারাপ তো নয়ই বরং অশ্বিনী ভুঁইমালীর বউয়ের হাতের সাজিকুলো সরেস বলেই সুখ্যাতি পেয়েছে বাজারে। দামও একপয়সা দু'পয়সা বেশি উঠেছে। যাদব ঢুলী প্রথম দু-একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, 'আমাদের বেত আর বাঁশই যখন কেড়ে নিচ্ছ তোমরা, ঢোলটাও নাও। ঢ্যাং ঢ্যাং করে বিয়েতে মুখেভাতে পুজোয় পার্বণে বাজিয়ে বেড়াবে।'

অশ্বিনী চটে উঠে বলেছিল, 'কেন রে তোদের ঢোল আমরা নিতে যাব কেন। আমরা কি ঋষি ঢুলী আমরা কি মুচি চামার?'

যাদব বলেছিল, 'এতকাল ছিলে না, কিন্তু এবার আমাদের মত মুচি চামারই হয়ে যাবে দাদা, ধামা যখন বুনতে শুরু করেছ। চামড়ার চটি জুতোয় হাত দিতে আর কতক্ষণ। তাই করো, তোমরাও ঢোল বাজাও, জুতো তৈরি করো, আমাদের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দাও তোমাদের। মিলেমিশে আমরা এক হয়ে যাই।'

অশ্বিনী তেমনি রেগে জবাব দিয়েছিল, 'ঈস, সখ দেখ শুয়োরের বাচ্চার। বলে কিনা ছেলেমেয়ের বিয়ে দাও, দরকার হলে আমাদের ছেলেরা তোদের

মেয়েদের ভিতর থেকে দু'চার গণ্ডা ষাঁড়ই রেখে নিতে পারবে। বিয়ের দরকার হবে না।'

যাদব বলেছিল, 'ষাঁড় রাখারাখি তো সেই সত্যিযুগ থেকেই চলছে দাদা। আমাদের জাতের ছেলেরা তোমাদের মেয়েদের ষাঁড় রাখছে আবার তোমাদের ছেলেরা পিছনে ঘুরেছে আমাদের বউঝিদের। তেমন গোপন মিল-মিশের কথা তো সকলেই জানে। এবার কলিযুগে রীতি-নিয়মটা বদলে যাক। জানাজানিটা আরও ভালো করে হোক ঢাকে ঢোলে।'

কিন্তু হাসিঠাট্টার কথা নয়। অশ্বিনীর পরে কার্তিকের ভাই নরহরিও বেতের কাজ শুরু করেছে দেখা গেল। ধামাসাজি নয় সে কোত্থেকে বুনন শিখে এসেছে বসবার মোড়ার, চেয়ারের। কাঠের জিনিসের দাম অনেক বেশি। এ অঞ্চলে পাওয়াও যায় না তেমন। ভাল ছুতোর নেই রাইগঞ্জের কাছে ধারে। ফলে বাজারে মোড়া, চেয়ার-চৌকি মাঝে মাঝে বেশ বিক্রি হয়। এতকাল এ সব কাজ ঢুলীদেরই বাঁধা ছিল। বিয়েতে অন্নপ্রাসনে তারা ঢাক বাজাত। আর অবসর সময়ে মেয়েপুরুষে মিলে করত বাঁশের কাজ বেতের কাজ; কচি পাঁঠার চামড়ায় ছেয়ে দিত ঢোল খোল, কেউ কেউ সাধারণ আটপৌরে ধরনের চটি স্যাণ্ডেলও তৈরি করত। চামড়ায় এখনও ভুঁইমালীরা হাত দেয় নি, কিন্তু বাঁশ আর বেত ঢুলীদের হাত থেকে তারা ছিনিয়ে নেবার জো করেছে। তাদের মোড়ল জলধরের কাছে নালিশ জানিয়ে কোন ফল হয় নি। জলধর বলেছে, 'ঝোপে বাঁশ আছে বেত আছে। হাতও দু'খানা করে আছে প্রত্যেক ঢুলীর। এমন তো নয় যে ভুঁইমালীরা তাদের হাত জোর করে চেপে রেখেছে কি বাঁশ আর বেত সব দখল করে নিয়েছে মুল্লুকের। যার যা খুশি সে তাই করে খাবে। কারও বাড়া ভাত তো কেউ আর কেড়ে খাচ্ছে না।'

কিন্তু এ তো প্রায় বাড়া ভাত কেড়ে খাওয়ারই সামিল। একজনের জাত ব্যবসা যদি আর একজনে শুরু করে, ছেলেপুলে নিয়ে সে ভাত করে খাবে কি করে। গাঁয়ের মধ্যে কুণ্ডুরাও সব চেয়ে প্রধান। তাঁরা জাতেও উঁচু, অবস্থায় মান-সম্মানেও উঁচু। মামলা মোকদ্দমার পরামর্শও তাঁরাই দেন, আবার ঘরোয়া ঝগড়া-ঝাঁটি বিবাদ-বিসংবাদে মীমাংসা মিটমাটও করেন। সেই কুণ্ডুদের বড়কর্তা রসময়ের কাছেও দরবার করতে গিয়েছিল ঢুলীরা। কিন্তু কোন লাভ হয় নি। রসময়ের জমির বর্গা চাষ করে ভুঁইমালীরা। দরকার হলে জনমজুর

কৃষাণ কামলা খাটে। ফলে তাদেরই কোল টেনে কথা বলেছিলেন রসময় কুণ্ডু। বলেছিলেন, 'বেশ তো ভুঁইমালীরা বেতের কাজ ধরেছে, তোরা কোদাল ধর, কুড়ুল ধর। কামলা কিষাণগিরি কর। কাজকর্মের কি অভাব আছে নাকি দুনিয়ায় যে তাই নিয়ে কামড়া-কামড়ি করে মরবি। কেন, তোদের ভরত ঢুলীও তো গিয়ে করাত ধরেছে শুকচাঁদ ভুঁইমালীর সঙ্গে। তার জন্য তো কেউ ওরা নালিশ দরবার করতে আসে নি।'

মুখ চুন করে ফিরে এসেছিল যাদব আর রামলালের দল। কিন্তু মনে মনে ভুঁইমালীদের ওপর রাগটা তাদের রয়েই গিয়েছিল। ভুঁইমালীদের আখেজও নিতান্ত কম ছিল না। আকালের বছর না খেয়ে শুকিয়ে মরে দেশান্তরী হয়ে গিয়ে গাঁয়ে মাত্র পাঁচ-সাত ঘর ঢুলীই এখন পর্যন্ত টিকে আছে। বলতে গেলে ভুঁইমালীদের রক্ষণা-বেক্ষণের মধ্যে আছে ঢুলীরা। কিন্তু তবু তেজ দেখ, স্পর্ধা দেখ তাদের। এত বড় বুকের পাটা রয়েছে যে ভুঁইমালীদের নামে গেছে কুণ্ডুকর্তাদের কাছে নালিশ করতে। ব্যাপারটি মুখ বুজে সহ্য করবার মত নয়। সহ্য ভুঁইমালীরা করে শুনি। সুযোগ মত তারা ঢুলীদের ঠাট্টা করেছে, টিটকারী দিয়েছে বকুনি ধমকানিও কম দেয় নি।

কিন্তু ঢুলীদের এবারকার স্পর্ধা আর অত্যাচার সব কিছুকে ছাড়িয়ে গেল। ভুঁইমালীরা ক্ষেপে উঠল এর প্রতিশোধ নিতে হবে। গগন অবশ্য ক্ষমা চেয়েছে। কিন্তু বুড়োমানুষের অমন অনুনয় মানতে রাজী নয় ভুঁইমালীরা। ভরত আর যাদব রামলালের রোখ তো তারা স্বচক্ষে দেখেছে! স্বকর্ণে শুনেছে তাদের দেমাকের কথা, 'যা করেছি বেশ করেছি।' এরপর আর ক্ষমা করবার কি থাকে মানুষকে।

শুকচাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু ভরত। একসঙ্গে দু'বছর ধরে করাত টানছে। সে বলল, 'যেতে দাও, যেতে দাও, যা হবার হয়ে গেছে। এ নিয়ে আবার একটা—'

কার্তিক বলল, 'তোমার আর কি। তোমার তো আর সমাজ সামাজিকতা নেই ; স্বজাতির ওপর কোন মায়া-মমতাও নেই তোমার। তুমি তো ও কথা বলবেই। দেশ গাঁয়ে তো আর থাক না। বছরের মধ্যে এগার মাস এ গঞ্জে ও বন্দরে করাত কাঁধে নিয়ে ঘুরে বেড়াও। বাড়ি ঘরে যদি থাকতে তাহলে ও কথা আর বলতে পারতে না। জাতের ওপর আপনা থেকেই একটা মায়া জন্মাত।'

শুকচাঁদ হেসে একটা বিড়ি ধরালে, বলল, 'দরকার নেই আমার অমন মায়ায়। এই বেশ আছি। তোমাদের জাতের মায়া মানে তো বেচারা ঘরকয়েক ঢুলীকে খুঁচিয়ে অস্থির করে তোলা। আমি ওসবের মধ্যে নেই। এতে তোমরা আমাকে একঘরেই করো আর যাই করো।'

শুকচাঁদের সঙ্গে কথা বলা বৃথা। কার্তিক জলধরের দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মোড়ল জ্যেঠা, তোমার কি মত। ঢুলীরা যে কেশব বেচারাকে অমন করে জাতে মারল, তারপর হাতে মারল এর কি একটা পেরতিকার করবে না তোমরা। এমনি করে করে আহ্লাদে আহ্লাদে বুঝি ঘাড়ে তুলবে ওদের? আজ কেশবকে মারল, কাল মারবে অশ্বিনীকে।'

শুকচাঁদ একটু ধোঁয়া ছাড়ল বিড়ির, বলল, 'তোমার নিজের কথাটাও মনে রেখ কার্তিক। আমার তো মনে হয় অশ্বিনীর চেয়ে রাগ ওদের তোমারই ওপর বেশি।'

শুকচাঁদ চিরকালই এমনি ফাজিল ফক্কড় ধরনের মানুষ। কোন কাজের কথা তার সঙ্গে বলার জো নেই। সব তার কাছে যেন কেবল ঠাট্টা টিটকারীর জিনিস। গোটা দুনিয়াটা যেন তার ঠাট্টাতে উড়ে যাবে। বিরক্ত হয়ে কার্তিক তার কথার কোন জবাব দিল না। জলধরকেই উদ্দেশ করে বলল, 'চুপ করে রইবে নাকি মোড়ল জ্যাঠা?'

জলধর বলল, 'নারে বাপু, চুপ করে থাকব কেন। চুপ করে থাকব না। তাই বলে তোর মত মার ধরের মধ্যেও আগে যেতে চাই না। তোদের আর কি, লোকে দোষ দিলে আমাকেই দেবে। আমাকেই নিন্দা করবে গাঁ সুদ্ধু লোক। তার চেয়ে কুণ্ডুকর্তারা যখন আছেন, তাদের একবার বলে দেখি। কোন বিধি-ব্যবস্থা যদি তাঁরা না করেন তখন দেখা যাবে। আছেন যখন তাঁরা মাথার ওপর বিপদে-আপদে দেখছেন, কাজকর্ম দিয়ে অন্ন যোগাচ্ছেন; তাঁদের কাছে জিজ্ঞাসাবাদ না করে কিছু করা ভাল হয় না কার্তিক।'

শেষ পর্যন্ত তাই ঠিক হল বৈঠকে। এবার আর ঢুলীরা নয় দলবলে ভারি হয়েও ভুঁইমালীরাই প্রথম গিয়ে এবার নালিশ করল রসময় কুণ্ডুর কাছে।

পরদিন সন্ধ্যার পর রসময় কুণ্ডুর বৈঠকখানায় দরবার বসল ঢুলী আর ভুঁইমালীদের। রসময় কুণ্ডু সাবধান করে দিয়েছিলেন, 'খবরদার, হাট

মেলাতে পারবি নে এখানে এসে। ভিড় চেঁচামেচি সহ্য করতে পারব না আমি তা আগেই বলে দিচ্ছি।'

জলধর করজোড়ে সবিনয়ে বলেছিল, 'আজ্ঞে না কর্তা, চেঁচামেচি হবে কেন, আপনার আজ্ঞা ছাড়া ভুঁইমালীদের কেউ টু শব্দটি পর্যন্ত করবে না দেখে নেবেন।'

রসময় বলেছিলেন, 'কথাগুলি মনে থাকে যেন। ঢুলীদেরও বলে দিস! যাদের আসা দরকার, যারা কেবল মাতব্বর গোছের লোক তারাই যেন শুধু আসে এখানে। একগাদা বাজে লোক এসে না যেন ভিড় জমায়।'

রসময় কুণ্ডু গাঁয়ের মধ্যে অন্যতম ধনী এবং মান্যগণ্য মানুষ। সবাই তাঁকে সমীহ করে চলে। রাইগঞ্জে বড় আড়ৎ আছে তেল, নুন, কেরোসিনের। জায়গা জমি জোত তালুকও করেছেন কিছু কিছু। ঢুলীরা তাঁর ভিটেবাড়ির প্রজা, ভুঁইমালীরাও তাঁর নিতান্ত অনুগত। জমির বর্গা চষে, ডাক দিলে লাঠি হাতে পাশে এসে দাঁড়ায়, আধা-বয়সী মেয়েরা এসে বাড়ির কাজকর্ম করে দেয়, ধান ভানে, চিঁড়া কোটে, উঠান এবং ঘরের ভিত লেপে সুন্দর করে দেয়। কেবল রসময় কুণ্ডুর বাড়িতেই নয়, কুণ্ডুপাড়ার, বামুন কায়েতদের পাড়ায় সম্পন্ন গৃহস্থ ঘরেও ঢুলীদের, ভুঁইমালীদের স্ত্রী-পুরুষেরা এ সব কাজকর্ম করে। আর তাই নিয়ে ঈর্ষা করে পরস্পরকে। একজন আর একজনের বিরুদ্ধে মনিবের কান ভারি করে তোলে। পরের ঘরের মেয়েমানুষের নামে অসতীত্বের অপবাদ রটায়, পুরুষের বিরুদ্ধে বদনাম দেয় চুরি-ছেঁচড়ামির। প্রতিযোগিতা বাপ ভাইয়ের সঙ্গেও চলে, দলাদলি হয় নিজেদের মধ্যে। তবু যেখানে জাতের কথা ওঠে, প্রশ্ন ওঠে শ্রেষ্ঠত্বের ছোটবড়ত্বের জাত হিসাবে সুযোগ পাওয়া না পাওয়ার সেখানে ঢুলীরা, ভুঁইমালীরা তাদের জাতের ভিত্তিতেই আলাদা হয়ে দাঁড়ায়।

শালুর তৈরি লাল রঙের ছোট একটি থলের মধ্যে হরিনামের মালা জপ করতে করতে রসময় কুণ্ডু এসে বসলেন চেয়ারে। দলের মাতব্বর বলে জলধর আর গগন দু'খানা জলচৌকি পেয়েছে। অন্যান্য সবাই মাদুর বিছিয়ে বসল। একই মাদুরের ওপর দুই দলের বসবার বন্দোবস্ত, তবু মাঝখানে যাতায়াতের জন্যে ফাঁক রইল একটু। দুইদল আলাদা আলাদা হয়ে বসল স্পর্শ বাঁচিয়ে। কেবল শুকচাঁদ বসল ভরতের পাশ ঘেঁষে। জলধরের ইচ্ছা ছিল না তাকে সঙ্গে আনবার। কিন্তু শুকচাঁদ জোর করে এসেছে। বলেছে, 'বাঃ, এত বড়

একটি রঙ-তামাসার ব্যাপার হচ্ছে, তোমরা সবাই দেখবে আর আমি দেখতে পাব না ?'

'রঙ-তামাসার ব্যাপার ?' রাগে দাঁত কিড়মিড় করে উঠেছিল জলধর, 'দাঁড়াও, ব্যাপারটা চুকে যাক, তারপর তোমার রঙ-তামাসা আমি বের করছি।'

কিন্তু ঘরে ঢুকেই ঢুলী ভুঁইমালীদের বিরোধ সম্পর্কে প্রথমেই যে কথা বললেন রসময় কুণ্ডু তার সঙ্গে যেন খানিকটা মিল আছে শুকচাঁদের কথার ঢঙের। প্রারম্ভে রসময় দুইদলকেই এক চোট ধমক দিয়ে বললেন, 'এই যে জলধর, এই যে গগন, সাঙ্গোপাঙ্গরা সব এসেছে তো ? আবার বুঝি বাধিয়ে এনেছ আর এক দফা ? আচ্ছা, খেয়ে না খেয়ে তোদের ঝগড়া-বিবাদ মিটানো ছাড়া কি আর কাজকর্ম নেই মানুষের ? দু'দিন বাদে বাদেই একটি না একটি বিবাদ বাধাবি। তোরা কাণ্ড ঘটাবি, আর আমার যত সব জরুরী কাজ পণ্ড করবি ? বয়স তো দু'জনেরই হয়েছে। এখন থেকে ঝগড়া-বিবাদটি একটু কমা, যার যার পাড়ার ছেলে-ছোকরা চ্যাংড়াদের একটু শাসনে রাখ বুঝেছিস ?'

গগন নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল। জলধর বলল, 'আজ্ঞে, এতো সোজা কথা কর্তা, না বুঝবার কি আছে।' কিন্তু একটা কথা জলধর ঠিক বুঝে উঠতে পারল না। নিজেদের মধ্যে বিবাদ করে সুবিচারের আশায় এখানে তারা এসেছে বলে কুণ্ডুদের বড়কর্তা তাঁর কাজকর্ম নষ্ট করবার জন্যে বকুনি দিচ্ছেন ; কিন্তু জলধররা যদি এখানে না এসে নিজেরা-ই শালিস দরবার করত তাহলেও কি খুশি হতেন বড়কর্তা ? হতেন যে না তার প্রমাণ আগেও পেয়েছে জলধর। নিকুঞ্জ ভুঁইমালীর বিধবা স্ত্রী তারাদাসীকে বের করে নিয়ে গিয়েছিল তার প্রতিবেশী কৈলাস ; জলধর নিজে নিয়েছিল সেই বিচারের ভার। তাই নিয়ে বেশ অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন রসময় ; বলেছিলেন, 'খুব মাতব্বর হয়েছিস দেখছি, শালিস দরবারের বুদ্ধি মাথার মধ্যে বুঝি একেবারে গজগজ করে। নিজেরাই একেবারে হর্তা-কর্তা বিধাতা।'

কোন ব্যাপারের মীমাংসার জন্যে বড়কর্তার কাছে আসলেও দোষ, না আসলেও দোষ। মনে মনে অবশ্য মোটামুটি বুঝে নিয়েছে জলধর যে এই দুই দোষের মধ্যে না আসার দোষটাই গুরুতর। এলে মুখে যত রুষ্ট ভাবই দেখান না বড়কর্তা মনে মনে খুশি হন। আর রসময় কুণ্ডু খুশি থাকলে, সদয় থাকলে অনেক লাভ। তার জন্যে কেবল একটা কেন, দিনে একগণ্ডা বিবাদও নিজেদের মধ্যে যেন লাগিয়ে রাখা যায়।

তবু খট করে রসময়ের তিরস্কারটি ভারি কানে লাগল জলধরের ; 'দু'দিন বাদে-বাদেই একটা না একটা বিবাদ বাধাবি তোরা আচ্ছা ওস্তাদ হয়েছিস সব ?'

ওস্তাদ হয়েছে বলেই কি তারা বিবাদ বাধায় ? জবাবটা ফস করে মুখে এসে গেল জলধরের, তেমনি করজোড়েই বলল, 'আজ্ঞে বড়কর্তা, বিবাদ তো আমরা ইচ্ছা করে বাধাই নে, বিবাদ আমাদের মধ্যে লেগে যায়।'

রসময় ধমক দিয়ে উঠলেন, 'লেগে যায় ? বিবাদের বুঝি হাত পা আছে ? কেউ না বাধালে বিবাদ বুঝি আপনিই এসে গায়ের সঙ্গে লেগে থাকে।'

জলধর নিজেকে সংশোধন করে বলল, 'আজ্ঞে তা কেন বড়কর্তা। বিবাদ তো বাধিয়েছে এবার ঢুলীরা, সবার মূলে আছে এই গগন ঢুলী। গগনই তো আমাদের জাত মারবার জন্য করল কাণ্ডটা। কেশবকে নানান লোভ দেখিয়ে সানাই বাজিয়ে এল বিদেশে বিভূঁয়ে। একসঙ্গে বসে ভাত খেল। ভুঁইমালীদের সর্বনাশের আর বাকি রাখল কি, গগন যদি এসব কাণ্ড না করত তাহলে তো কোন গোলই বাধত না বড়কর্তা।'

গগন সেদিন সর্বসমক্ষে ক্ষমা চেয়েছে ভুঁইমালীদের কাছে। তার বিরুদ্ধে বেশি কিছু বলবার ইচ্ছা ছিল না জলধরের। ইচ্ছা ছিল কেবল ঢুলী পাড়ার চ্যাংড়া ছোঁড়াগুলিকেই সায়েস্তা করবার, কিন্তু রসময়ের ধমক খেয়ে মনটা এত বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠল জলধরের যে গগনের বিরুদ্ধেই তার সমস্ত বিষোদ্গার বেরিয়ে এল।

গগন কি বলতে যাচ্ছিল তাকে থামিয়ে দিয়ে রুখে উঠল যাদব, 'হ্যাঁ, পাঁচ সাত বছরের ছেলেমানুষ কি না কেশব যে তাকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে? সে তো সামনেই আছে। তাকেই জিজ্ঞেস করুন না বড়কর্তা। বাপের বেটা যদি হয়, মিথ্যা কথা সে বলতে পারবে না। তাকে জিজ্ঞেস করুন কেন সে গিয়েছিল আমাদের সঙ্গে, গাঁজার পয়সার টান পড়লে সে কেবল আমাদের ঢুলীদের সাথে কেন, মেথর মুদ্দাফরাসের সাথে গিয়েও কাজে নামতে পারে।'

রসময় ফের ধমকের সুরে বললেন, 'আঃ, অত চেঁচাচ্ছিস কেন তুই তাই বলে ? এ কি একটা হাট, না বাজার, না ভদ্রলোকের বাড়ি। যা বলবি ধীরে-সুস্থে আস্তে আস্তে বল। তা ছাড়া বলতে বললুম গগনকে ; তুই নিলি তার মুখের কথা কেড়ে। ব্যাপার কি গগন ঢুলী, পাড়ার মোড়লগিরি কি

আজকাল যাদবের হাতে ছেড়ে দিয়েছ? তুমি কি পেনসন নিয়েছ না কি রিটায়ার করে।'

গগন শান্তস্বরে জবাব দিল, 'আজ্ঞে না কর্তা মোড়লী ছেড়ে দেব কেন।'

রসময় বললেন, 'ছেড়ে দাও নি তো কি কেড়ে নিয়েছে যাদব?'

গগন বলল, 'আজ্ঞে না কর্তা তাও নয়। মোড়লী আপনা-আপনিই গিয়ে ওর হাতে পড়তে চাচ্ছে না। পাড়ায় যাকে মানে গণে সেই তো মোড়ল। আমি বুড়ো হয়ে গেছি, দেহও ভাল না, পাড়ার শালিস দরবার এখন যাদবই দেখে। নিজের যোগ্য ছেলেপুলে তো নেই। ভরসা ছিল ভরতকে দিয়ে, তা ও তো করাত নিয়েই রইল। যাদব ছাড়া আর লোক কই পাড়ায়।' শেষের দিকে গলাটা ভারি করুণ শোনাল গগনের।

যাদব জিভ কেটে বলল, 'আজ্ঞে না বড়কর্তা। মোড়লী আমি কেড়েও নিই নি, মোড়লী আমার হাতেও আসে নি। গগন জ্যেঠার মোড়লী গগন জ্যেঠারই থাক। আমি তা নিতে যাব কেন। আমি কেবল হক কথা বলতে এসেছি, আর হক কথা বলতে বিষ্টু ঢুলীও ডরাত না, তার ছেলে যাদব ঢুলীও ডরায় না কাউকে।'

'হুঁ,' হরিনামের মালা রেখে হুঁকো ধরলেন রসময়, তারপর হঠাৎ যেন চোখ পড়ল তাঁর কেশবের ওপর। মাথায় পটি বেঁধে ভুঁইমালী দলের পিছনে চুপ-চাপ বসে ছিল কেশব। পুরোনো শাড়ির খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে সযত্নে কে যেন পটি বেঁধে দিয়েছে তার মাথায়। শাড়ির নকসা পাড়ের খানিকটা অংশ বেশ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

রসময় একটু ভ্রূ কুঁচকে সেই দিকে এক পলক তাকিয়ে রইলেন। মনে পড়ল এই নকসী পেড়ে শাড়ি তিনি মাধবদাসের বোষ্টমী রাসেশ্বরীকে পরতে দেখেছিলেন। রসময় বললেন, 'ব্যাপার কি রে কেশব, হল কি তোর মাথায়। বৈরাগীর আখড়ায় এখনও খুব আড্ডা জমাচ্ছিস বুঝি? ঠেসে গাঁজা টানছিস বুঝি খুব? কলকে না ফেটে মাথা ফেটেছে।'

রসময়ের রসিকতায় কেউ কেউ মুখ নিচু করে হাসল। কিন্তু ভুঁইমালীদের মোড়ল জলধর রীতিমত গম্ভীর মুখে বলল, 'আজ্ঞে না কর্তা, গাঁজায় মাথা ফাটলে তো কোন গোলই ছিল না, কেশবের মাথা ফাটিয়েছে গগনের জামাই ভরত। সেই বিচারের জন্যেই তো আপনার কাছে আসা, লোভ দেখিয়ে জাতও মারবে আবার মাথাও ফাটাবে, একি মগের মুল্লুক পেয়েছে নাকি ঢুলীরা যে

এমন যা খুশি তাই অনাচার-বদাচার করবে? আপনি রয়েছেন না মাথার ওপর। আপনার ভিটে বাড়ির প্রজা বলে আপনি তো আর কারও কোন টেনে কথা বলবেন না বড়কর্তা, আপনি ন্যাজ্য সুবিচার করবেন। ঢুলীরা যেমন আপনার ভিটে বাড়ির প্রজা আমরাও তো তেমনি আপনার হাতের লাঠি, পায়ের জুতো, আমরা সুবিচার চাই আপনার কাছে।'

.তারপর ঢুলী আর ভুঁইমালীদের বাদপ্রতিবাদের ভিতর দিয়ে রসময়ের কাছে সমস্ত রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হল। চেঁচামেচি করলে যাদব ভরতেরা, মৃদুস্বরে টিপ্পনী কাটল শুকচাঁদ, জলধর সমস্ত দোষ গগন আর তার দলের ঢুলীদের ঘাড়ে ফেলতে চেষ্টা করে বার বার বলতে লাগল যে, 'গেঁজেল হলেও জাতে তো ভুঁইমালী কেশব। গগন ঢুলী কোন্ আক্কেলে তার জাত মারল, অপমান করল,.মুখ হাসাল এ গাঁয়ের ভুঁইমালীদের?'

গগনকে জিজ্ঞাসা করলেন রসময়, 'কি হে গগন, তোমার কি বলবার আছে বল, বয়স তো আর কম হয় নি, মাথার চুলে বেশ পাক ধরে গেছে। একটা জাতের তুমি মোড়ল। তুমি এমন অপকর্ম করতে গেলে কার কথায়? জাত মারলে কেন ভুঁইমালীদের?'

গগন বলল, 'আজ্ঞে বড়কর্তা, জিজ্ঞেস করে দেখুন কেশবের কাছে। আমিই ওকে ডেকে নিয়েছিলাম না কেশব নিজেই যেচে সঙ্গে গিয়েছিল আমাদের, পেট টিপলে ঢুলীদের ভাত এখনও ওর মুখ থেকে বেরোয় বড়কর্তা। নতুন করে ঢুলীরা ওর আর কি জাত মারতে যাবে? আপনার তো আর কিছু অজানা নেই, আপনি সব জানেন, সব বোঝেন, এই অজুহাতে ভুঁইমালীরা আমাদের সঙ্গে একটা বিবাদ বাধাতে চাইছে হুজুর, জব্দ করতে চাইছে আমাদের।'

রসময় এবার ফিরে তাকালেন কেশবের দিকে, 'সত্যি করে বল কেন গিয়েছিলি তুই ঢুলীদের সঙ্গে? গাঁজার লোভ দেখিয়ে নিয়েছিল তোকে গগন, না আরও কিছু ব্যাপার ছিল তলে তলে? গগনের জামাই ভরত যা বলছে আরও পাঁচজনে যা বলছে—'

জলধর উৎসাহ দিয়ে বলল, 'ভয় নেই তোর কেশব, যা ঘটেছিল সব খুলে বল বড়কর্তাকে। দোষ-ঘাট তো তোর একার হয় নি, এক হাতে তালি বাজে না কোনদিন। গগনের মেয়ে সিন্দুরের ব্যাপার-ট্যাপার যা জানিস সব বল এখানে।'

এই উৎসাহ জলধর আর তার সাঙ্গোপাঙ্গরা কেবল আজ নয়, কদিন ধরেই দিচ্ছে। অত সংকোচ কেন কেশবের। বদনাম রটেছে, মাথা ফেটেছে এখন আর সংকোচ করে লাভ কি? তার চেয়ে হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিক কেশব। জোর করে বলুক যা ঘটেছিল। জামাইয়ের ওপর রাগ করে মেয়েকে তার হাতেই তুলে দিয়েছিল গগন একথা পরিষ্কার করে সবাইকে জানিয়ে দিক কেশব। জব্দ হোক ঢুলীরা চিরকালের জন্যে, মুখে কালি পড়ুক তাদের। নিজের জন্যে যেন কোন রকম চিন্তা করে না কেশব। জলধর তাকে অভয় দিয়ে বলেছে পুরুষের কোনদিন জাত যায় না, পুরুষের কলঙ্ক স্থায়ী হয় না বেশিদিন। নিজের আত্মীয়-স্বজনের ভিতর থেকে খোঁজখবর করে দেখে-শুনে বেশ ভাল একটি ডাগর সুন্দরী মেয়ে তার জন্যে এনে দেবে জলধর। কেশবের ভয় কি? ন্যাংটার আবার বাটপাড়ের ভয়। রাসেশ্বরীর রাসলীলার যে সঙ্গী তার আবার ভয় কিসের কলঙ্কের। প্রায়শ্চিত্ত করে তাকে জাতে তুলে নেবে ভুঁইমালীরা। পটি বাঁধা ফাটা মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে কেশব রাজী হয়েছিল জলধরদের কথায়, ঘাড় নেড়ে জানিয়েছিল তার সম্মতি।

তাই রসময় যখন কেশবকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করলেন, উপস্থিত সমস্ত ভুঁইমালীদের চোখ তার মুখের ওপর এসে পড়ল। কেশব তাকাল একবার জলধরের দিকে, তারপর রসময়ের দিকে চেয়ে বলল, 'না হুজুর, কেবল গাঁজার লোভেই জাত দিতে যাই নি আমি ঢুলীদের সঙ্গে। আরও কারণ ছিল।'

সবাই উৎসুক এবং কৌতূহলী হয়ে উঠল। চাপা হাসি খেলে গেল ভুঁইমালীদের ঠোঁটে আর চোখের কোণে।

রসময় বললেন, 'কারণ ছিল? কি কারণ ছিল বল স্পষ্ট করে।' গগনের মুখের দিকে হঠাৎ চোখ পড়ল কেশবের। ভারি নির্জীব আর হয়রান মনে হচ্ছে গগনকে, যেন কত পরিশ্রম করে এসেছে খানিক আগে। কেশবের মনে পড়ল যখন সত্যি সত্যিই পরিশ্রম করতে হয়েছিল গগনকে, ঢোল কাঁধে-তিন ক্রোশ পথ হেঁটে গিয়ে বিয়ের বাজনা বাজিয়েছিল গগন, সেদিন কিন্তু এত হয়রান দেখা যায় নি তাকে। সেদিন উৎসাহে উল্লাসে ঢোল নিয়ে নাচতে শুরু করেছিল গগন, কেবল নিজেই নাচে নি, কাঁধ চাপড়ে, বাহবা দিয়ে কেশবের প্রাণ মনও নাচিয়ে তুলেছিল গগন। বলেছিল, কেশবের মত সানাই এ মুল্লুকে আর কেউ বাজাতে পারে না, এমন কি গগনের জামাই ভরত ঢুলীও নয়।

রসময় আর একবার ধমক দিয়ে উঠলেন, 'এই হারামজাদা গেঁজেল, চুপ করে রইলি যে। বল যা বলবি, ঈস লাজের তো আর সীমা নেই, লাজে একেবারে মরে যাচ্ছে দেখ না।'

কেশব বলল, 'আজ্ঞে না বড়কর্তা, লাজ নেই আমার। আপনাকে সব বলব, তার আবার লাজ কিসের।'

রসময় বললেন, 'লজ্জা যদি না থাকে তবে বলে ফেল বাপু আর দিক করিস নে।'

কেশব বলল, 'কেবল গাঁজার লোভে নয় বড়কর্তা। ঢুলীদের সঙ্গ নেওয়ায় আরও কারণ ছিল। বিয়ের আসরে অনেক লোকজনের মধ্যে সানাই বাজাবার ভারি লোভ ছিল বড়কর্তা। এতকাল বনে-বাদাড়ে বাঁশী বাজিয়েছি। কেউ শুনেছে কেউ শোনে নি। এবার দেখলাম গিয়ে পরখ করে। বাজাবার মত বাজাতে জানলে, বড়কর্তা সবাই শোনে।'

ভুঁইমালীরা হৈহৈ করে উঠল, 'গাঁজাখোর, বদমাস কেশব সব বানিয়ে বলছে বড়কর্তা। গগন ওকে চোখ ঠেরে দলে টেনে নিয়েছে।'

ঢুলীরা বলল, 'কখনও না, চোখ কেশবকে তোমরাই ঠারতে চেয়েছিলে, পার নি। ধম্মের মুখ চেয়ে কেশব সত্যি কথা বলেছে। তোমাদের সাজানো কথায় রাজী হয় নি।'

রসময় বললেন, 'সানাই ছাড়া যদি এর ভিতর আর কিছু নাই-ই থাকবে, ভরত ঢুলী তোর মাথা ফাটাতে গেল কেন শুনি।'

কেশব বলল, 'আজ্ঞে বড়কর্তা, সে কথা ভরত ঢুলীকেই জিজ্ঞেস করুন। দুপুর রোদে পাঁচজনের কানাঘুষায় ভরতদার মাথার ঠিক ছিল না। কি বল ভরতদা, তাই না?'

উপায়ন্তর না দেখে ভরতও তাই স্বীকার করল।

নিজের মান নিজে রাখতে বিরক্ত হয়ে উঠে পড়লেন রসময়। সময় নষ্ট এবং শান্তি ভঙ্গের জন্যে ঢুলীদের জরিমানা করলেন দশ টাকা, ভুঁইমালীদেরও তাই। বলে দিলেন, এ টাকা বারোয়ারী কালীপূজোর তহবিলে জমা হবে। টাকা যেন কালই পৌঁছে দেয় সবাই।'

কুণ্ডুদের বৈঠকখানা থেকে দুই দলই মুখ কালো করে বেরিয়ে এল। শুকচাঁদ বলল, 'কেমন, তখনই বলেছিলুম না আমি, যে দরকার নেই ওসব শালিস বিচারে? নিজেদের ঝগড়া-ঝাঁটি নিজেরাই মিটিয়ে ফেল। সে কথা

তো কারও গায়ে লাগল না। লাগবে কেন? গরীবের কথা বাসি হওয়ার আগে তো আর মিষ্টি লাগে না। এখন বোঝ মজা। মর জরিমানা দিয়ে। তবিল ভরতি করো রসময় কুণ্ডুর।'

কথাগুলি কেবল শুকচাঁদের মুখ থেকে বেরুলেও মনের কথা যে শুধু শুকচাঁদের নয়, ঢুলী আর ভুঁইমালীর দলের প্রায় প্রত্যেকেরই তা তাদের হুঁ হাঁ আর মাথা নাড়বার ধরণেই বোঝা গেল। কেবল ধরা দিল না দলপতি জলধর। শুকচাঁদের দিকে তাকিয়ে সে ধমকের স্বরে বলল, 'তুই থাম দেখি শুকো। মুরোদ নেই আধা পয়সার কেবল বড় বড় কথা। রসময় কুণ্ডু যেন তোদের দশ বিশ টাকার কাঙাল যে এই টাকা আদায় না হলে ভাত জুটবে না তার। শুনলি নে বারোয়ারী কালীপূজো হবে। জরিমানার নাম করে সেই চাঁদাই আদায় করে নিতে চাচ্ছে কায়দা করে? চাপ না দিলে, জোর জবরদস্তি না করলে তো একটা পয়সাও ঘর থেকে বের করিবি নে কেউ?'

অশ্বিনী ভুঁইমালী চটে উঠে বলল, 'কেন করব শুনি। পয়সা কি মাগনা আসে নাকি মাতব্বর? নাকি ঘরে মাগ-ছেলে নেই কারও? ভাত-কাপড় দিতে হয় না তাদের? বারোয়ারী কালীপূজোর চাঁদা কুণ্ডুর তবিলে আমরা কেন দিতে যাব শুনি? চাঁদা করে পূজো আমরা করতে পারি নে? চাঁদাই হোক আর জরিমানাই হোক একটা পয়সাও আমরা দিতে পারব না। যে পারে সে দিক গিয়ে। মাতব্বরী রাখবার দায় আছে যার সেই গাঁট থেকে বার করুক গিয়ে টাকা।'

রাগে অবশিষ্ট কয়েকটি দাঁত কিড়মিড় করল জলধর। কিন্তু অনুগামী ছোকরাদের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে ঠাণ্ডা মেজাজেই বলতে চেষ্টা করল, একটু আস্তে অশ্বিনী আস্তে, রাত বিরাতের সময়। এক পাড়ার কথা আর এক পাড়ায় ভেসে যায়। তাছাড়া এ সময় গাছপালারও কান খাড়া হয়ে থাকে। কোন্ কথা কার কানে যাবে তার ঠিক কি, যা বলবি একটু নিচু গলায় বল।'

অশ্বিনী বলল, 'গলা উঁচু-নিচু তুমিই করো মাতব্বর আমরা অত উঁচু-নিচুর ধার ধারি নে।'

শান্ত গলায় জলধর অবুঝদের বোঝাবার চেষ্টা করে বলল, 'ধারবি বাপু ধারবি। এখন না ধারিস পাঁচ-দশ বছর পরে ধারবি। আরে এককালে ওরকম গায়ে গরম রক্ত আর মুখে গরম গরম কথা আমাদেরও ছিল। তখন আমরাও বাপ-দাদার সাথে অমন কত তর্ক-বিতর্ক করেছি। এখন বুঝি

ওসব গরম রক্ত আর গরম কথা পরে আপনা-আপনিই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। আর ঠাণ্ডা মাথা ছাড়া কোন কাজ হয় না ছুনিয়ায়। আরে ঘরে মাগ-ছেলে আছে বলে, তাদের খাওয়াতে পরাতে হয় বলেই তো যত ভাবনা। মনিবের মান রেখে মনিবের মন যুগিয়ে চলতে হয় তো তাদের কথা মনে করেই। সংসার ছেড়ে নেংটি পরে বেরিয়ে গেলে কেবল একজন ওপরের মনিবকে মানলেই চলে। যতক্ষণ ঘর-সংসার আছে ততক্ষণ সব আছে। কাছারির পেয়াদা থানার জমাদার ভিটে বাড়ির মালিকের গোমস্তা—খাতির করে চলতে হয় সবাইকেই। এই হল ছুনিয়ার নিয়ম।'

কিন্তু ছুনিয়ার নিয়ম সম্বন্ধে দলের ছোকরাদের তেমন কোন ঔৎসুক্য দেখা গেল না। অশ্বিনী শুকচাঁদের কাছ থেকে একটা বিড়ি চেয়ে নিয়ে ধরাল। তারপর নিজেরা গল্প করতে করতে এগিয়ে চলল।

রাত অন্ধকার তবু আলো আনে নি সঙ্গে। অতি কষ্টে সংগ্রহ করতে হয় কেরোসিন তেল। দামও চড়া। মিছামিছি কে নষ্ট করতে যাবে সে তেল।

ছুইদিকে ঘন জঙ্গল। বাঁশের ঝাড়, গাব আর খুদে জামের গাছগুলির সঙ্গে ঘন পুরু অন্ধকার যেন একেবারে লেপ্টে রয়েছে। চোখে ভাল ঠাহর হয় না জলধরের। একবার একটা গাছের শিকড়ের সঙ্গে, আর একবার থান ইঁটের সঙ্গে হোঁচট খেল জলধর। অথচ কতকালের পুরোনো চেনা পথ, ছেলেবেলা থেকে কত গভীর রাত্রে একা একা চলা-ফেরা করেছে এ সব পথ দিয়ে। ঘোর অমাবস্যার রাত্রেও কোন অসুবিধা হয় নি। কিন্তু আজকাল কেবল দিন কালই বদলে যায় নি, কেবল ছেলে-ছোকরাগুলিই অবাধ্য গোঁয়ার-গোবিন্দ হয়ে ওঠে নি, চিরপরিচিত পথঘাটও যেন বদলে গেছে। যে সব পথে আগেকার দিনে চোখ বুজে ছুটে চলতে পারত জলধর এখন সেই পথে পা টিপে টিপে চলেও রেহাই নেই। পায়ে পায়ে হোঁচট খেতে হয়। বুড়ো বয়সের সঙ্গে সবাই ইয়ার্কি দেয়। কাউকে বিশ্বাস করা যায় না, কারও ওপর নির্ভর করা যায় না এতটুকু। অল্প বয়সী ছেলে-ছোকরা থেকে শুরু করে নিজের চোখ কান, হাত পা-গুলি পর্যন্ত সুবিধা পেলেই বিরুদ্ধতা করে। যেমন মতিগতি দেখা গেল অশ্বিনীদের। জরিমানার চাঁদা আদায় করা শক্ত হবে। হয়তো মাফ করবার জন্যে রসময় কুণ্ডুরই হাতে-পায়ে ধরতে হবে গিয়ে জলধরকে। ভরসা আছে তেমন করে ধরতে পারলে রসময় 'না' করতে পারবেন

না। আরও অবশ্য এক কাজ করতে পারে জলধর। রসময়ের কাছে নালিশ করতে পারে এই সব গোঁয়ার-গোবিন্দ অশ্বিনী শুকচাঁদের নামে। তাহলে অবশ্য একদিনেই সায়েস্তা হয়ে ওঠে ওরা। রসময় যদি রাগ করে বর্গা জমি ছাড়িয়ে নেন অশ্বিনীর কাছ থেকে, অন্তত ছাড়িয়ে নেওয়ার ভয় দেখান তাহলেই মুখ চুন হয়ে যায় অশ্বিনীর। এ সব গরম গরম বুলি বন্ধ হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু তা করতে চায় না জলধর। তাতে নিজেরই মান থাকে না। দলের লোক মাতব্বর বলে মানছে না, তর্ক করছে মুখে মুখে, মনিব হলেও একথা রসময়ের কাছে কি করে বলা যায়। তাতে কি মুখ থাকে না মান থাকে জলধরের? তার চেয়ে দলের লোকের হয়ে জরিমানা মকুব করবার জন্যে গোপনে গিয়ে মনিবের হাতে-পায়ে ধরা অনেক ভাল, অনেক বুদ্ধিমানের কাজ। তাতে জাতভাইদের জন্যে যে মায়া-মমতা আছে জলধরের সেই কথাই বুঝতে পারবে রসময়, আসলে গগনের মত সেও যে নিজের মাতব্বরী আর শক্ত হাতে ধরে রাখতে পারছে না সে কথা আরও কিছুদিন গোপন রাখা যাবে। গগন ঢুলীর বিনয় অনুনয় আর অমন ঠাণ্ডা নরম মেজাজের মানে যেন এবার পরিষ্কার বুঝতে পারল জলধর। এই নরম নোয়ানো ভাবটাই আসলে বুড়ো বয়সের বল। ছিটে কঞ্চি যে ভাবে মাথা খাড়া করে থাকতে পারে ভারি মাথাওয়ালা বড়ো বাঁশের কি আর তা সাধ্য আছে? সে মাথা নোয়াতেই হয়। তবু ছিটে কঞ্চির চাইতে তার মান বেশি, দাম বেশি। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে, দিন কাল বদল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজের হাত পা'র কাজও তো বদলে যায়, যখন সড়কি বল্লম ধরবার মত জোর থাকে না হাতের, তখন সেই হাত দিয়েই জড়িয়ে ধরতে হয় পা। আসলে কাজ আদায় করা নিয়ে কথা। তা সড়কি ধরেই হোক আর পা ধরেই হোক।

অন্ধকারে পিছনে কার পায়ের শব্দ শোনা গেল। জলধর ঘাড় ফিরিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলল, 'কে।'

'আমি কেশব।'

'কেশব!' জলধর রাগে যেন ফেটে পড়ল, হারামজাদা গেঁজেল বদমাস! কোথায় ছিলি এতক্ষণ। মারের ভয়ে লুকিয়ে ছিলি বুঝি? কেশব শান্তস্বরে বলল, 'না, মাতব্বর জ্যাঠা।'

'না, মাতব্বর জ্যাঠা!' জলধর ভেংচি কেটে উঠল, 'তবে এতক্ষণ কোথায় ছিলি শুনি?'

কেশব কুণ্ঠাহীন স্বরে বলল, 'একটু দম দিয়ে আসতে গিয়েছিলুম বলাইদের ওখানে।'

প্রত্যেক পাড়ায় কোথায় কোথায় দম দেওয়ার আড্ডা আছে সে খবর কেশবরা রাখে। ভুঁইমালীদের স্বপক্ষে সাক্ষ্য দিতে এসে হঠাৎ তাদের বিরোধিতা করে বসে মাথা এমন গুলিয়ে গিয়েছিল কেশবের যে গাঁজার ধোঁয়া ছাড়া মাথা ঠিক রাখতে পারছিল না কেশব। জরিমানা আর রসময় কুণ্ডুর অসদ্ব্যবহার নিয়ে যখন ঢুলী আর ভুঁইমালীরা সকলেই উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল তখন সকলের অলক্ষ্যে অন্ধকারে কেশব পাশ কাটিয়ে সরে পড়েছিল।

জলধর তেমনি মুখ ভেংচে বলল, 'দম তোমাকে জন্মের মত দেওয়াবে এবার অশ্বিনী কার্তিকরা। বাঁদর পাজী বদমাস কোথাকার। চাঁদপানা মুখের লোভে গোটা ভুঁইমালী জাতটার মুখে চুনকালি দিয়ে এলি। ভেবেছিস ভুঁইমালীরা তোকে অমনি অমনি ছেড়ে দেবে? হাড় এক জায়গায় মাস এক জায়গায় করে ছাড়বে দেখে নিস। ঢুলীদের ভিতর থেকে তোর কোন্ বাবা এসে রক্ষা করে আমিও তাই দেখব।'

কেশব জলধরের ধমকানির কোন জবাব দিল না। নিঃশব্দে তার পিছনে পিছনে হাঁটতে লাগল। যতই ধমকাক যতই তাকে মারপিটের ভয় দেখাক জলধর—মনটা খুশি খুশি লাগছে তার। গাঁজার ধোঁয়া পড়ে সেই খুশি আরও বেড়ে গেছে। কেশবের মনে হয় একেক সময় একেক রকমের স্বাদ যেন গাঁজার। সুখের সময় এক রকম দুঃখের সময় আর এক রকম। আবার সুখ দুঃখের বাইরে মন যখন অদ্ভুত রকম ভোঁতা হয়ে থাকে তখন যেন আরেক রকম স্বাদ হয় বড় তামাকের। অদ্ভুত ক্ষমতা এ জিনিসের। দুঃখের সময় দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়, সুখের সময় সুখকে দেয় বাড়িয়ে।

অনেক রাত্রে মাধব বৈরাগীর আখড়ায় ফিরে এসে মনের এই ধারণা ভাবনার কথা নিজের ভাষায় রাসেশ্বরীকে বলতে চেষ্টা করল কেশব, একেক সময় ভারি ইচ্ছা হয় ছেড়ে দি। লোকে যখন নিন্দে-মন্দ করে। কিন্তু ছাড়তে গিয়ে ছাড়তে পারি না। এমন ফুর্তি আর কোন জিনিসে নেই।

রাসেশ্বরী গুনগুন করে উঠল, ''গাঁজা তোর পাতায় রস। না খেলে যে প্রাণে মরি, খেলে অপযশ', তাই না? মনের মধ্যে আজ তোমার এত ফুর্তির ঢেউই বা হঠাৎ কেন উঠল ছোট বৈরাগী, বল দেখি সত্যি করে।'

এক কোণে রেড়ীর তেলের মৃদু আলো জ্বলছে লাল পোড়া মাটির দীপে।

আর এক পাশে পাটি বিছিয়ে টান হয়ে শুয়ে পড়ে নাক ডাকাচ্ছে মাধবদাস। ঢাকা দেওয়া ভাতের থালা এনে রাসেশ্বরী কেশবের সামনে ধরে দিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'এত ফুর্তি কিসের? শালিসে জিতল কারা, ঢুলীরা না ভুঁইমালীরা?'

কেশব ডাল দিয়ে ভাত মাখতে মাখতে জবাব দিল, 'কেউ জেতে নি। সবাই ঠকে গেছে। জরিমানা হয়েছে দুই দলেরই। কেবল জিতেছি আমি।'

তারপর ভাত খেতে খেতে রসময় কুণ্ডুর শালিস বিচারের আগাগোড়া গল্প করে শোনাল কেশব রাসেশ্বরীকে। জলধরের ধমকানির কথাও গোপন করল না। রাসেশ্বরী বলল, 'ওরা আজই যে তোমাকে ভেঙে চুরে গুঁড়ো গুঁড়ো করে দেয় নি তাই তোমার চোদ্দপুরুষের ভাগ্যি। দিলেই ভাল হত।'

কেশব বলল, 'দিলেই ভাল হত? শেষে তুমিও বললে এই কথা?'

রাসেশ্বরীর ভ্রূ নেচে উঠল, 'বলব না? আমার সতীনের পক্ষ নিয়ে কথা বলবে তুমি আর আমি বুঝি তোমাকে আদর যত্ন করে খাওয়াব, পাখার বাতাস দিয়ে ঘুম পাড়াব?'

কেশব বিস্মিত হয়ে বলল, 'তোমার সতীন আবার কে?'

রাসেশ্বরী মুখ টিপে হাসল, 'আহাহা আবার ন্যাকামি হচ্ছে। তোমার সিন্দুর গো সিন্দুর, নামটা বারে বারে কানে শুনতেও বুঝি ভাল লাগে।'

কেশব একবার তাকাল রাসেশ্বরীর দিকে, তারপর লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, 'কি যা তা বলছ।'

রাসেশ্বরীও সেই আরক্ত মুখের দিকে মুহূর্তকাল তাকিয়ে রইল তারপর তেমনি ঠোঁট টিপে হেসে বলল, 'যা তা নয় গো যা তা নয়। ঠিক কথাই বলছি। সিন্দুর আমার নাগরকে কেড়ে নিচ্ছে আমার কাছ থেকে। দরবারে আমাকে ঠকিয়ে তুমি জিতে এসেছ।'

কেশব কোন কথা বলল না। বহুকাল ধরেই রাসেশ্বরী তার সঙ্গে এমন ঠাট্টা-পরিহাস করে আসছে। কিন্তু কিছুতেই সত্যি সত্যি ধরা দেয় নি কেশবের কাছে। বৈরাগী হলে কি হবে সংসার আশ্রমে মাধবদাসরা উঁচু ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতের মানুষ ছিল গাঁয়ের অনেক লোকেরই তাই ধারণা। এদের চাল-চলন ধরণ-ধারণ দেখে কেশবের সেই কথাই সত্য বলে বিশ্বাস হয়। মাধবদাসকে দেখে অবশ্য এখন আর চেনা যায় না। চাল-চলন ধরণ-ধারণে

অশিক্ষিত নিচু জাতের ভেকধারী বৈরাগী বলেই মনে হয় অনেক সময়। রাসেশ্বরীও কেশব এবং তার সঙ্গী সাকরেদদের সঙ্গে সমান ভাবে মেশে, ঠাট্টা-তামাসা করে, নাগর আর ছোট বৈরাগী বলে পরিহাস করে কেশবের সঙ্গে। কিন্তু কেশব দু'একবার ভুল করেই বুঝতে পেরেছে জিনিসটা পরিহাসের এক রতিও বেশি নয়। তাই যদি হত তাহলে মাধবদাস এখন মুখ টিপে টিপে হাসতে পারত না। নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারত না নাক ডাকিয়ে। ওপর ওপর কোন বাদ-বিচার নেই রাসেশ্বরীর। ভুঁইমালীর ছেলে বলে কোন রকম হেলা অশ্রদ্ধা নেই কেশবের ওপর। ভাত রেঁধে দেয়, ভাত বেড়ে দেয়, নিজের হাতে এঁটো পরিষ্কার করে, যে সব দিন মাধবদাসের আঙিনায় রাত কাটায় কেশব, রাসেশ্বরী নিজের হাতে বিছানা পেতে দেয়, পাখার বাতাস করে। আদর যত্নের কিছুমাত্র ত্রুটি করে না। তবু যে রাসেশ্বরী উঁচু জাতের মানুষ, উঁচু রকম তার রুচি প্রবৃত্তি একথা বুঝতে কেশবের বাকি থাকে না। নাগর তো ভাল, রাসেশ্বরীর নফর হওয়ার যোগ্যতাও কেশবের নেই এ কথা সে ভাল করেই জানে। কেবল এইটুকুই সে বুঝে উঠতে পারে না, মাধবদাসকে দেখিয়ে দেখিয়ে এত রঙ্গরস তাকে নিয়ে করে কেন রাসেশ্বরী, কেন এমন মাত্রা ছাড়ানো ঠাট্টা-তামাসা করতে থাকে তার সঙ্গে।

কেশবকে নিরুত্তরে খেয়ে যেতে দেখে রাসেশ্বরী আর একবার খোঁচা দিয়ে বলল, 'কিন্তু ছোট বৈরাগী, ভেবে ভেবে এত যে আকুল হচ্ছ সিন্দুরের জন্যে, জাত-কুল যে এমন করে ছেড়ে দিচ্ছ শেষ পর্যন্ত কি কোন সুবিধা হবে তোমার? গায়ের জোরে পাল্লা দিয়ে পারবে তো ভরত ঢুলীর সঙ্গে? না কি আবার মাথা-টাথা ফাটিয়ে এসে অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকবে। এবারে কিন্তু তাহলে এখানে আর জায়গা হবে না।'

কেশব বলল, 'না, গায়ের জোরে পারব না।'

রাসেশ্বরী বলল, 'তবে কিসের জোরে পারবে শুনি?'

কেশব বলল, 'পরে শুনো।'

খাওদা-দাওয়া সেরে মুখ-হাত ধুয়ে মাধবদাসের পাশে এসে বসল কেশব। কল্কেতে তামাক সাজল। বড় না, ছোটই, তারপর মাধবদাসের উদ্দেশ্যে সবিনয়ে বলল, 'আজ্ঞা করুন, গোসাঁইজী।'

ভারি পাতলা ঘুম মাধবদাসের। এক ডাকেই ঘুম ভাঙল, নাক ডাকানিও বন্ধ হল সঙ্গে সঙ্গে, মাধবদাস বলল, 'উঁহু, ধরিয়ে দে।'

কেশব বলল, 'জোর আগুন আছে গোসাঁই ঠাকুর। দু' একটা টান দিলে আপনিই ধরে যাবে, ধরুন, নিন।'

মাধবদাস আর কোন কথা না বলে হুঁকোটা নিল হাত বাড়িয়ে।

কেশব উঠে গিয়ে বেড়ায় ঝোলানো বাঁশীটা নিয়ে এল ঘর থেকে।

রাসেশ্বরী খেতে বসেছিল। কেশবের পায়ের সাড়া পেয়ে মুখ ফিরিয়ে মুচকি হেসে বলল, 'গায়ের জোরে হেরে গিয়ে ভরত ঢুলীর সঙ্গে বুঝি এই বাঁশীর জোরে পাল্লা দেওয়ার চেষ্টায় আছ? কিন্তু ছোট বৈরাগী, আজকালকার রাধারা কি কেবল বাঁশীর স্বরে বাইরে আসে?'

কেশব জবাব দিল, 'বাইরে আসবার তো দরকার নেই ঠাকরুণ। বাঁশী শুনে ঘরের মধ্যে বসে বসে যদি শ্রীরাধার মন হাঁসফাঁস করে ওঠে তাই যথেষ্ট।'

পরামর্শটা শুকচাঁদই দিল ভরত ঢুলীকে 'কেলেঙ্কারী যা হবার তাতো হল। বিচার-আচারও খুব দেখলুম এদের। এবার পালা বউ নিয়ে।'

ভরত বলল, 'পালাব মানে?'

'মানে আবার কিরে শালা। নিজে না পালালে ওই কেশব ভুঁইমালীই একদিন তোর বউ নিয়ে পালাবে দেখে নিস।'

ভরত চোখ গরম করে বলল, 'এই শুকচাঁদ।'

শুকচাঁদ হেসে তরল স্বরে বলল, 'কিরে ভরত।' তারপর পরম বিজ্ঞের মত গম্ভীর ভঙ্গীতে উপদেশের ধরনে বলল, 'না না, গরম হবার সময় নয়। ঠাণ্ডা মাথায় ভাল করে ভেবে দেখ। সত্য হোক মিথ্যা হোক একটা কথা যখন রটেছে সিন্দুর আর কেশবকে নিয়ে তখন ফের ওকে এমন একা একা রেখে যাওয়া কি ভাল। তুই থাকবি সারা বছর কাঠথলিতে আর বউটিকে ফেলে যাবি এখানে তোর ওই বুড়ো শ্বশুরটির ভরসায়। যুবতী বউ নিয়ে ঘরে দোর দিলে তার কি আর কোন দিকে চোখ থাকে না কান থাকে, বল দেখি।'

ভরত খানিকক্ষণ কি চিন্তা করে বলল, 'কথা তুই ঠিকই বলেছিস। কিন্তু করি কি বল দেখি।'

শুকচাঁদ বলল, 'করবি আবার কি। কাজ নেই তোর আর গঞ্জের কাঠের থলিতে গিয়ে। গাঁয়েই থাক, বউকে পাহারা দে আগের মত সানাই বাজা।'

'তাতে পেট ভরবে ?'

'দেখ ভেবে, ভরে নাকি। না ভরে তো বউ সুদ্ধু নিয়ে চল। আজে-বাজে কত ঘর পড়ে আছে সিকদার বাবুদের। চেয়ে-চিন্তে এক আধখানা কি আর জুটিয়ে দিতে পারব না তোদের বাসার জন্যে? সারা বছর হাত পুড়িয়ে রেঁধে খাস, এখন থেকে বউ রেঁধে দেবে। আরে পুরুষের রান্না কি আর একটা রান্না। কোনদিন নুনে মুখ পোড়ে, কোনদিন ঝালে বুক পোড়ে, মেয়েমানুষের হাত পড়লে ডালভাত আর বেগুন পোড়াও অমৃত হয়ে ওঠে তা জানিস। সে ভাতে গায়ের বল বাড়ে, করাতের জোড় বাড়ে।'

ভরত বলল, 'এত যদি গুণাগুণ মেয়েমানুষের রান্নার, এতকাল নিজের বউকে নিস নি কেন। না কি সে রাঁধতে জানে না ?'

শুকচাঁদ জবাব দিল, 'জানবে না কেন। কিন্তু তার চেয়েও বেশি জানে পোয়াতী হতে। দেখছিস না, কাছিমের মত কতগুলি কাচ্চা-বাচ্চা। শহর বন্দরে অত পুষ্যি থাকলে কি আর পোষানো যায় ? তার চেয়ে তোর বউ বেশ ছোলাহাতী, ছোলদাঁতী আছে। খরচ কম, ঝামেলা কম। মাসে মাসে খোরাকির টাকাটা তুলে দেব তোর হাতে, বাস খালাস। এতকাল তো আমাকে দিয়ে রাঁধিয়ে খেলি এবার বউয়ের রান্না দিন কতক খাওয়া।'

কথাটা মিথ্যা নয়। গঞ্জে কাজকর্ম সেরে শুকচাঁদই রাঁধে বেশির ভাগ দিন। ভরত এক-আধটু যোগান দেয়—তারপর হাত-পা গুটিয়ে বসে বসে বিড়ি টানে। ভাত খাবার আগে হাজার বার শুকচাঁদের গালাগাল আর দাঁত খিঁচুনি খেতে হয় তাকে, 'এই জম্মকুঁড়ে, পায়ের ওপর পা তুলে অমন করে বসে থাকলেই ভাত নামবে নাকি। আমি কি তোর সাতপুরুষের পরিবার যে রোজ দু'বেলা তোকে রেঁধে রেঁধে খাওয়াব।'

গালাগালের চোটে যেদিন ভরত গিয়ে বসে ভাতের হাঁড়ির কাছে, ভাত তরকারি সেদিন আর মুখে দেওয়ার মত হয় না। শুকচাঁদের বকুনি খেতে খেতেই পেট ভরে।

অথচ হাতের কাছে কত সহজ সমাধান রয়েছে। রয়েছে সিন্দুর। কিন্তু তাকে নিয়ে সাড়ে সাতকাঠির গঞ্জে এসে এর আগে বাসা বাঁধবার কথা শুকচাঁদেরও মনে হয় নি, ভরতেরও নয়। শহর বন্দরে গিয়ে বউ-ছেলে নিয়ে বাসা করে বাবু-ভুঁইয়ারা, যারা উকিল ডাক্তার মাষ্টার মোক্তার, যারা অফিস

আদালতে কাজকর্ম করে। কিন্তু সাড়ে সাতকাঠির বন্দরে যারা মিস্ত্রী, ঘরামী, কামলা-করাতীর কাজ করে ভরতদের মত তাদের প্রায় কারুরই বাসা নেই। সবাই নিজেরা রান্না-বান্না করে খায়, শরীর খারাপ থাকলে গিয়ে ওঠে হোটেলে। কামলা-করাতী তো ভাল, সিকদারবাবুদের বালতি কড়াই হাতা খুন্তির দোকানে যারা বেচা-কেনা করে, খাতা লেখে তারাও কেউ শহরে বউ নিয়ে থাকতে পারে না। এই নিয়ে একদিন ভরতের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সিকদারদের দোকানের ভূষণ দাসের সঙ্গে। ভূষণ দাস পালা পোরেনে লোহার চাকতি বল্টু পেরেক ওজন করে। সেদিন দেখা গেল ভাল করে পালা ধরতে পারে না। হাতের আঙুলে নেকড়া জড়ানো।

'আঙুলে কি হয়েছে দাস মশাই।'

'কেটে গেছে বঁটিতে মাছ কুটতে গিয়ে।'

ভরতের সঙ্গে শুকচাঁদও ছিল। সে সঙ্গে সঙ্গে সহানুভূতি জানিয়ে বলেছিল, ঈস, আহা হা। এসব মাছ কোটা-টোটা কি আপনাদের সাজে। তা অত কষ্ট কেন করেন আপনারা। পরিবার নিয়ে এলেই তো পারেন।'

ভূষণ দাস একটু হেসেছিল, 'পরিবার? এই মাইনেয়? পোষাব কি করে করাতী?'

শুকচাঁদ বলেছিল, 'আপনারা একথা বলেন বাবু। কত দেখি রোজগার পাতি করেন।'

'হ্যাঁ, একেবারে বস্তা বোঝাই টাকা। তোমরা কি ভাব করাতী বল দেখি। তোমাদের চাইতে রোজগার আমাদের কম, অথচ খরচ বেশি। এখন ভাবি তোমাদের মত অমন গতর খাটাতে শেখাই ভাল ছিল।'

এতখানি প্রাণখুলে কথাবার্তা ভূষণ দাস তাদের সঙ্গে বলে না। কিন্তু সেদিন দোকানে তেমন খদ্দেরের ভিড় ছিল না, কর্তারাও এদিক ওদিক কোথায় বেরিয়ে পড়েছিলেন, তাছাড়া আঙুল কেটে যাওয়ায় মনটাও বোধ হয় খুব নরম হয়ে পড়েছিল ভূষণ দাসের।

'বউ আনা তো ভাল, আঙুল কেটে এমন দশা হয়েছে যে বউয়ের কাছে পাঁচ সাত দিনের মধ্যে একখানা চিঠি পর্যন্ত লিখতে পারব না।' সখেদে জানিয়েছিল ভূষণ দাস।

সেদিন সন্ধ্যার পর রান্না-বান্নার আয়োজন করতে করতে ভরত আর শুকচাঁদ টাকা পয়সার অভাবে ভূষণ দাসের বউ না আনতে পারার জন্যেই দুঃখ

করেছিল, নিজেদের অক্ষমতার কথা মনেও হয় নি, তা নিয়ে আলোচনাও ওঠে নি।

কিন্তু আলোচনাটা শুকচাঁদ যখন আজ তুলল, তখন মন্দ লাগল না ভরতের কাছে। বরং কেমন যেন একটু নতুন নতুনই লাগল। প্রায় অবিশ্বাস্য, অভাবিত এক আনন্দে মন ভরে উঠল ভরতের। শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে, উঠতে বসতে তার খোঁটা শোনার হাত থেকে রেহাই পেয়ে অন্য কোথাও ঘর-বাড়ি করবার জন্যে মন আকুল হয়ে উঠেছিল ভরতের। কিন্তু সুবিধা মত ভিটে-মাটি পাওয়া যায় না। কম খাজনায় যে সব ভিটা পাওয়া যায় তা যেমন জঙ্গলে, তেমনি নিচু আর খানা-খন্দে ভরা। গাছপালা কেটে, সাফ করে মাটি ফেলে উঁচু করে সে সব জায়গায় নতুন ঘর-বাড়ি করতে অনেক খরচ। তত টাকা কোথায় পাবে ভরত। কিন্তু সব মুশকিল আসান হয়ে যায় সিন্দুরকে নিয়ে শহর বন্দরে চলে গেলে; জংলা ভিটা-মাটি সাফ করারও দরকার হয় না। কোঠা ঘর, টিনের ঘর, সনের ঘর কত রকমের ঘর সেখানে তোলা আছে। যার যা পছন্দ। পছন্দ ঠিক নয়, পছন্দ তো ভরতেরও কোঠা বাড়ি। যার যা সাধ্য। ঢুকে পড়লেই হল আর মাসে মাসে কয়েকটা টাকা ভাড়া হিসাবে ফেলে দিলেই হল। কিন্তু ঘর ভাড়া দিয়ে খোরাকী দিয়ে কি কুলনো যাবে? শেষকালে কি হাবুডুবু খাবে না ভরত? বউকে মনে হবে না মাথায় দেড়মণি বস্তার মত?

শুকচাঁদ বলল, 'দূর বোকা, খাটুয়ে পুরুষের সঙ্গে মেয়েমানুষ যদি থাকে, খাটবার পর যদি আঁচল দিয়ে ঘাম মুছিয়ে দেয় বুকের পিঠের, নিজের হাতে পিঁড়ি পেতে ভাত-তরকারি তুলে দেয় সামনে, খাওয়ার সময় কাছে এসে বসে, শোবার সময় পা টেপে, মাথা টেপে সে মেয়েমানুষের ওজন দেড়মণ কেন আড়াই মণ হলেও হালকা সোলার মত মনে হয় পুরুষের মত পুরুষের কাছে। মানুষের তখন খাটবার শক্তি বাড়ে, বুদ্ধি বিবেচনা বাড়ে, রোজগারও দ্বিগুণ হয়ে যায়। ভয় পাস কেন অত, আমিও তো থাকব সঙ্গে সঙ্গে।'

তা ঠিক ভয়ের মত ভরসাও আছে। শুকচাঁদ থাকবে সঙ্গে। যেমন ফিকিরবাজ, তেমনি করিতকর্মা লোক। হাতে ধরে ভরতকে করাত টানতে শিখিয়েছে শুকচাঁদ, নিজের হাতে দিনের পর দিন ভাত রেঁধে দিয়েছে তাকে। বিদেশে বিভুঁয়ে অভাবে অনটনে এমন বন্ধু আর হয় না।

ভরত বলল, 'বেশ, তাহলে চল যাই কালই। থাকবার মত একটু ডেরা-ঢেরা ঠিক করি গিয়ে সেখানে। তারপর সিন্দুরকে এসে একজন নিয়ে যাব।'

শুকচাঁদ বলল, 'দূর বোকা। কত কোঠা বাড়ি যেন লোকে তুলে ধরেছে সেখানে, আর কত টাকাকড়ি যেন আছে তোর ট্যাঁকে যে যাওয়া মাত্রই বাসা ভাড়া ঠিক হয়ে যাবে। শহরে থাকবার জায়গার কত টানাটন তা জানিস।'

উৎসাহ উদ্দীপনা সব যেন একেবারে চুপসে গেল ভরতের। শুকচাঁদ কি তাহলে এতক্ষণ ঠাট্টা করছিল, ইয়ার্কি দিচ্ছিল বন্ধুর সঙ্গে? সাড়ে সাতকাঠির বন্দরে গিয়ে বাসা বাঁধবার প্রস্তাবটি তাহলে কি শুকচাঁদের পরিহাস ছাড়া আর কিছু নয়?

ভরত বলল, 'তবে? এতক্ষণ ধরে মিছামিছি বকবক করলি। তোর সব তাতেই ইয়ার্কি।'

শুকচাঁদ মাথা নেড়ে বলল, 'না, মোটেই ইয়ার্কি নয়। কাজের কথা নিয়ে কোন দিন ঠাট্টা-তামাসা করে না শুকু ভুঁইমালী। শালা সম্বন্ধীর সঙ্গেও না, ইয়ার বন্ধুর সঙ্গেও না। তুই এতকাল সঙ্গে সঙ্গে থেকেও আমাকে তাহলে এক ফোঁটাও চিনতে পারিস নি। ওপর থেকে শুকু ভুঁইমালীকে মানুষ যত হালকা মনে করে, শুকচাঁদ ভিতরে ভিতরে তার একেবারে উল্টো। সীসার মত ভারী।'

কিন্তু ভারিক্কি ধরনেও বন্দরে গিয়ে বাসা বাঁধবার পদ্ধতি সম্বন্ধে যে প্রস্তাব করল শুকচাঁদ, ভরতের কাছে তাও নিতান্তই হালকা ইয়ার্কির মত মনে হল। শুকচাঁদ বলল, 'বাসা-টাসা ঠিক করে আনা কোন কাজের কথা নয়। একেবারে সিন্দুরকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে এই সঙ্গে। নিয়ে উঠতে হবে একেবারে সিকদারদের মেজোবাবুর সামনে, আপনার ভরসাতেই নিয়ে এসেছি কর্তা ব্যবস্থা বন্দোবস্ত যা করবার আপনিই করে দিন, আমরা কিছু জানি না।'

সিকদারদের মেজোকর্তা বনবিহারীবাবু নিশ্চয়ই খুব বকাবকি করবেন। কিন্তু মুখ বুজে কানে তুলো দিয়ে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিতে পারলেই বাস, কাজ হাসিল। একটা না একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই। এ ধরনের চটপট কিছু একটা না করে ফেললে কোনদিন ভরত শহরে গিয়ে বাস করতে পারবে না। মেজোকর্তা যদি কেবল গালাগালি দিয়েই ক্ষান্ত থাকেন, অন্য কোন ব্যবস্থা নাই করেন ভরত আর শুকচাঁদের জন্যে, তখন নিজেদের পাথার বলে বুঝতে হবে, যুঝতে হবে, সাহস না লক্ষ্মী।

মেয়েমানুষ সঙ্গে থাকলে পুরুষের সেই সাহস আরও বাড়ে। ঘাড়ে বোঝা চাপলেই ঘাড় আরও শক্ত হয়।

ভরতকে যখন সঙ্গে নিয়েছিল শুকচাঁদ, তখনো তো ভরত কতবার এক পা এগিয়েছে, দু-পা পিছিয়েছে। সানাই বাজানো ছাড়া কোন কাজকর্ম জানে না ভরত, শহর বন্দরে গিয়ে খাবে কি করে। কিন্তু জোর করে সত্যি সত্যি হাত ধরে টান দিয়েছিল বলেই না ভরত সঙ্গ ধরেছে শুকচাঁদের, করাত ধরেছে। আর তার ফলে লোকসান হয়েছে না লাভ হয়েছে সে হিসাব নিজের মনে মনে খতিয়ে দেখলেই তো পারে ভরত। পুরুষমানুষের সাহসই লক্ষ্মী। সাহস ছাড়া কাজ হয় নাকি কোন।

ভরত ঘরে গিয়ে সিন্দুরের কাছেও পাড়ল কথাটা, যাচাই করে দেখতে চাইল শুকচাঁদের বুদ্ধিটা সত্যি সত্যিই সুবুদ্ধি কিনা, চাল নেই চুলো নেই হঠাৎ খপ করে গিয়ে বউ-ঝি নিয়ে ওঠাটা কি সমীচীন হবে। অবশ্য দু'চার দিন কাটাবার মত থাকবার জায়গা যে না পাওয়া যাবে তা নয়। সিকদারদের গুদামের পিছনে কাঠ থলির কাছাকাছি যোগেন মিস্ত্রীর বাসা আছে সেখানে গিয়েও ওঠা যাবে। কিন্তু এভাবে যাওয়াটা ঠিক হবে কি।

ঠিক আর বেঠিক কি, শহরে যাওয়ার কথা শুনে সিন্দুর একেবারে নেচে উঠল। দু'হাতে গলা জড়িয়ে ধরল ভরতের, 'কোন কথা শুনতে চাই না আমি, শহরে আমাকে নিয়ে যেতেই হবে। শুকদা যখন সঙ্গে থাকবে তখন আর ভাবনা কি। থাকবার জায়গা যদি শেষ পর্যন্ত নাই মেলে আমাদের এখানকার ঘর-বাড়ী তো রইলই। ফের এসে উঠব এখানে। কিন্তু আমি আর কোন কথা শুনবো না যাবই তোমার সঙ্গে। আচ্ছা সেখানে নাকি হাওয়া গাড়ী আছে, সেখানে নাকি ছবিতে কথা বলে?'

ভরত ঘাড় নাড়ল 'হ্যাঁ' বলে। নিজের আঁচলের সঙ্গে ভরতের কোচার খুঁটে গিঁট দিল সিন্দুর, 'এই বেঁধে রাখলুম, দেখি এ বাঁধন কি করে খোল, দেখি কি করে ফেলে যাও আমাকে।'

অদ্ভুত এক আনন্দে সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল ভরতের, খুঁটে খুঁটে এই গিঁট সাত বছর আগে বাঁধা হয়েছিল। কেশবের সঙ্গে সিন্দুরের নামের যে গিঁট পড়ে গেছে, দু'জনের নাম জড়িয়ে যে কেলেঙ্কারীর কথা উঠেছে পাড়ায়, তাতে সন্দেহ হয়েছিল ভরতের সঙ্গে সেই সাত বছর আগের বাঁধা গিঁট বুঝি নিজের হাতে খুলে ফেলেছে সিন্দুর। এই সব নিন্দা অপবাদের মূলে বুঝি

সত্যিই কিছু আছে। কিন্তু সিন্দুরের এই গলা জড়িয়ে ধরায় খুঁটে খুঁটে এই নতুন করে ফের গিঁট বাঁধায় মনে মনে ভারি আশ্বস্ত হল ভরত। না সে সব কিছু নয়, ভরত ছাড়া আর কাউকে মনে ধরে নি সিন্দুরের, ভরত ছাড়া সত্যিই আর কারও গলা জড়িয়ে ধরে নি সিন্দুর। বুক থেকে পাথরের বোঝা যেন নেমে গেল ভরতের। তার বদলে ফুলের মত, মাখনের মত নরম সিন্দুর বরন মুখ ভরতের বুকে লেগে রইল। সে মুখে কেবল একটি কথা 'আমাকে নিয়ে যেতে হবে শহরে।'

শহর তো ভাল, সিন্দুরকে নিয়ে এখন কোথায় না যেতে পারে ভরত সাত সমুদ্র তের নদীর পারে যে জায়গা আছে সেখানেও।

গোপনে গোপনে উদ্যোগ আয়োজন চলতে লাগল যাত্রার। বাঁধা হতে লাগল পোঁটলা-পুঁটলি। দেখতে দেখতে পাড়াময় খবরটা ছড়িয়ে পড়ল স্বামীর সঙ্গে সিন্দুরও যাচ্ছে সাড়ে সাতকাঠির বন্দরে। সেখানে তারা বাসা বেঁধে থাকবে, আর ফিরে আসবে না গাঁয়ে। কথাটা কানে গেল ঢুলীদের ভুঁইমালীদের, কানে গেল কেশবের, রাসেশ্বরীর, লক্ষ্মীর, সব চেয়ে পরে কানে গেল সিন্দুরের বাবা গগন ঢুলীর। ঢোল ছাওয়ার জন্যে পাঁঠার চামড়া সংগ্রহ করতে গিয়েছিল সে ভিন্ন গাঁয়ে। ফিরে আসবার সঙ্গে সঙ্গে নানা জনের কাছ থেকে নানারকম সুরে খবরটা তার কানে এসে পৌঁছল, 'আরে তোমার জামাই-মেয়ে নাকি শহরে যাচ্ছে?'

গগন অবাক্ হয়ে বলল, 'জামাই তো শহরেই থাকে। কিন্তু মেয়ে যাবে কেন। মেয়েমানুষের সঙ্গে শহরের কি সম্পর্ক? ঘরের মেয়েছেলে শহরে গিয়ে থাকে একথা শুনেছ নাকি কোনদিন?'

ভুঁইমালীদের মোড়ল জলধর বাঁকা হাসি হাসল, একেবারে না শুনবই বা কেন। বয়সকালের কথা কি বেমালুম ভুলে গেলে নাকি গগন ঢুলী? গঞ্জ বন্দরের সঙ্গে যে ধরনের মেয়েমানুষের সম্পর্ক থাকে তাদের কি চেন না, তাদের সঙ্গে কি বয়সের সময় দু'চার বারও জানা-শোনা হয় নি?'

'কি, কি বললে?' মাথা নাড়া দিয়ে উঠল গগন ঢুলী, 'বুড়ো হয়ে মরতে চলেছ মোড়ল, তবু বদমাসী গেল না তোমার; তবু স্বভাব বদলাল না? আমার খেয়ে তার নিজের সোয়ামীর হাত ধরে শহর বাজারে কেন জাহান্নামে যাক না, সেই তার স্বর্গ। তাতে তোমাদের কি, তোমরা কেন নাক ঢুকাতে আসবে তার মধ্যে?'

জলধরের সঙ্গে ঝগড়া করে গগন নিজের বাড়িতে এসে ঢুকল, তারপর মেয়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে ডাকাডাকি শুরু করে দিল, 'বলি ভরত, ও ভরত ?'

ভরত ঘরের মধ্যেই ছিল, কিন্তু সাড়া দিল না, স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে ইসারা করে বলল, 'যাও বুড়োর সঙ্গে তুমি কথা বল গিয়ে—আমি পারব না।'

সিন্দুর ঠোঁট টিপে হাসল, 'কেন আমি বলতে যাব কেন, তুমি যেতে পার না ? জোয়ান পুরুষ হয়ে এত ভয় বুড়ো শ্বশুরকে।'

ভরত মৃদুস্বরে বলল, 'আসলে ভয় তো আর বুড়ো শ্বশুরকে নয়। বুড়ো শ্বশুরের জোয়ান বয়সী মেয়েকেই যত ভয় ডর, রগচটা মানুষ রাগের মাথায় কি বলতে কি বলে ফেলব, শ্বশুরের মেয়ের মুখ ভারি হয়ে যাবে , তার চেয়ে বাপে মেয়েয় বোঝাপড়া হোক সেই ভাল।'

বিয়ের প্রথম বছরের মত খুব রসের কথা খুশির কথা বেরুচ্ছে ভরতের মুখ দিয়ে। ভারি খোশ মেজাজে আছে তার মন। সিন্দুর একবার আড়চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে কি দেখল। তার তাকানোর ভঙ্গিতেই ভরত বুঝতে পারল যে সিন্দুরের মনও আজ খুশিতে টগবগ করছে। শহর দেখবার আব্দার পূর্ণ হয়েছে তার, এতকাল ধরে অনুরোধ উপরোধেও যে কথায় রাজি করতে পারে নি সে ভরতকে, আজ ভরত নিজেই উপযাচক হয়ে সেই শহরে বাস করবার কথা তুলেছে, কেবল শহর এক পলকে দেখে ফিরে আসা নয়, শহরে মাসের পর মাস বাসা বেঁধে বাস করা। এই ঢুলী ভুঁইমালী পাড়ায় তো দূরের কথা, ভদ্রলোক বামুন-কায়েতদের পাড়ায়ও এমন সৌভাগ্য খুব কম বউ-ঝির ভাগ্যেই ঘটেছে।

গগন আর-একবার তাড়া দিল, 'কি হল তোদের ও সিন্দুর ? তোদের গুজগুজ ফিসফিস তো বেশ আমার কানে আসছে আর আমার চেঁচানি বুঝি কানেই ঢুকছে না।'

সিন্দুর এবার ঘরের ঝাঁপ খুলে দাওয়ায় এসে দাঁড়াল, 'তা কি বলছ বাবা।'

গগন বলল, 'তোকে আমার কিছু বলবার নেই, যতদিন কেবল তুই নিজের মেয়ে ছিলি, বলেছি, এখন তুই পরের ঘরের বউ, ভিতরে বাইরে একেবারে পর হয়ে গেছিস, তোকে আমি কিছুই বলব না, ডাক সেই হতচ্ছাড়া হারাম-জাদাকে, আমি তার সঙ্গেই কথা বলব।'

সিন্দুর বলল, 'তাকে আবার কেন বাবা। সে আসতে পারবে না, শুয়ে পড়েছে, শরীর ভারী খারাপ, যা জিজ্ঞেস করবার আমাকেই কর।'

গগন বলল, 'খারাপ? এই একটু আগেও তো দু'জনে বেশ দিব্যি কথা বলছিলে। বেশ, খারাপ থাকে খারাপই ভাল। কিন্তু তোরা নাকি শহরে যাচ্ছিস? কেন এমন মরবার বুদ্ধি হয়েছে কেন, তোদের। সেখানে খাবি কি থাকবি কোথায়।'

সিন্দুর শহর সম্বন্ধে খুব একটি ওয়াকিবহাল ভঙ্গিতে বলল, 'এখানে যা খাই এখানে যেমন ঘরে থাকি শহরেও এর চেয়ে ভাল ছাড়া খারাপ থাকব না। তার জন্যে তুমি ভেব না বাবা।'

গগন বলল, 'না আমি আর ভাবব কেন, আমার তো আর তোর জন্যে কোন ভাবনা-চিন্তাও নেই, কোন মায়া-মমতাও নেই, সব নদীর জলে ধুয়ে ফেলেছি, ভাবনা-চিন্তার কথা আমি বলছি না, আমি বলছি কাজ-কর্মের কথা, তোরা তো শহরে যাবি কিন্তু আমি যে গোঁসাইহাটির বায়না নিয়েছি তার কি হবে, এবারও কি কেশব গিয়ে সানাই বাজিয়ে আসবে নাকি।'

হঠাৎ বুকের ভিতর যেন ধক করে উঠল সিন্দুরের। কেশব! কেশবের কথা এ দু'দিন তার মনেই ছিল না, কেবল শহর দেখার, শহরে থাকার জল্পনা কল্পনা নিয়েই মত্ত ছিল সিন্দুর। এবার মনে পড়ল, মনে পড়ল সে শহরে কেশব যাবে না, কেশব এই গাঁয়েই থাকবে। আধাবয়সী বোষ্টমী রাসেশ্বরী দখল করে থাকবে কেশবকে। শহরে গিয়ে কলের ছবির নড়াচড়া আর কথা বলা সিন্দুর শুনতে পাবে, কিন্তু কেশবের নিজের গলা আর শুনতে পাবে না। নাইবা পেল, কি এমন ক্ষতি হবে তাতে, একটি গাঁজাখোর ভিন জাতের ভুঁইমালীর ছেলের সঙ্গে দেখা-শোনা হবে না বলে সিন্দুর কি স্বামীর সঙ্গে শহরে যাওয়া বন্ধ করবে নাকি?

গগন বলল, 'কি আমার কথার জবাব দিচ্ছিস না যে। ভরত যদি দু'একদিনের মধ্যে চলে যায়, আমার দলে সানাইদারী করবে কে শুনি? এত সব কাণ্ড কেলেঙ্কারীর পরও কি ফের আমি গিয়ে হাতে পায়ে ধরব নাকি সেই কেশব ভুঁইমালীর?'

সিন্দুর হঠাৎ বলে ফেলল, 'হাতে পায়ে ধরতে হবে না বাবা, সে নিজেই যেচে আসবে তোমার দলে সানাই বাজাতে।'

মমতায় ভারি মধুর শোনালো সিন্দুরের গলা। সেই সঙ্গে অদ্ভুত এক দাবির জোরও ফুটে উঠল।

গগন বলল, 'হ্যাঁ, যেচে আসবে? ওকে বলে গেছে। কেন, কেন সে আসবে শুনি?'

ঘরের ভিতরে কথাটা খট করে ভরতেরও কানে লেগেছে। মনের মধ্যে তারও প্রশ্ন উঠল, সত্যিই তো, কেন আসবে কেশব ঢুলীর দলে ফের সানাই বাজাতে? আর সেই সানাই নিয়ে যখন এত কাণ্ড হয়ে গেল। কান খাড়া করে রাখল ভরত, বাপের কথার কি জবাব দেয় সিন্দুর, তাই শোনবার জন্যে।

কথাটা বলে ফেলে সিন্দুর নিজেও যেন লজ্জিত হয়ে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি নিজের মনের ভাবটা ঢাকবার চেষ্টা করতে করতে ঠোঁটে হাসি টেনে বলল, 'কেন আবার আসবে। আসবে, সেবারও যে লোভে এসেছিল সেই লোভে। দু'ছিলিমের জায়গায় তিন ছিলিম গাঁজা কবলে দেখ ঠিক এসে সানাই ধরবে। তাছাড়া জাত তো গেছেই এবার আর ভয় কিসের।'

দুপুরের একটু আগে আগে ইয়াসিনের এক মাল্লাই নৌকা এসে ঘাটে ভিড়ল। ঘাট ঢুলী পাড়ার। কিন্তু যে কয়েক ঘর ভুঁইমালী একেবারে কাছাকাছি থাকে এ ঘাট তারাও ব্যবহার করে। মুখ ধোয়, চান করে, মেয়েরা বাসন-বাটি গা-কাপড় ধুয়ে জলের কলস কাখে তুলে নেয়। নৌকা যে কি জন্যে এসেছে কারও জানতে বুঝতে বাকি নেই, তবু ছেলেবুড়ো যেই ঘাটে আসে সেই একবার করে জিজ্ঞাসা করতে ছাড়ে না: 'ও মাঝি, নৌকা যাবে কোথায়। ভাড়া করল কে।'

প্রথম দু'তিনবার ভদ্রভাবে সদুত্তরই দেয় ইয়াসিন: 'নাও যাবে সাড়ে সাতকাঠির কাঠ থলিতে, কেরায়া করেছে গগন ঢুলীর জামাই ভরত ঢুলী। আজকাল বুঝি ভরত করাতী।'

কিন্তু দু'তিন বারের পর আর মেজাজ ঠিক থাকে না ইয়াসিনের, জিজ্ঞাসার জবাবে মুখ খিঁচিয়ে ওঠে, 'বাবারে বাবা, বলে বলে মুখ আমার ব্যথা হয়ে গেল। সব জিনিসের ট্যাক্স আছে আর আমার মুখের বুঝি ট্যাক্স নেই। কোথায় যাবে কি বিত্তান্ত আমি কিছু জানি নে, কিছু বলতে পারব না। অত

যদি জানবার সাধ থাকে ভরত ঢুলীর বাড়ী যাও, তাকে জিজ্ঞেস কর, তার পরিবারকে জিজ্ঞেস কর।

কথায় কথায় মুখ আর মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বুড়ো ইয়াসিন সেখের। বলে, 'শালা ঢুলীর আক্কেল দেখ। নৌকা কেরায়া করে বোধ হয় বসে আছে ঘরের মধ্যে। ফষ্টি-নষ্টি করছে বোধ হয় পরিবারের সঙ্গে। আরে ফষ্টি-নষ্টি তো আমার নায় এসেও করতে পারবি। ঘরের মত ছই রয়েছে, যার যা খুশি কর, কেউ দেখবেও না। বলতেও যাবে না। বল দেখি মশাইরা এর পর নৌকা ছেড়ে রাত দুপুরের আগে কেউ পৌঁছতে পারে সাড়ে সাতকাঠিতে? নায়ের নিচে আমার তো চাকা লাগানো নেই।'

তাড়াতাড়ি রওনা হয়ে পড়বার জন্যে ভরতও ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। থেকে থেকে তাড়া লাগাচ্ছিল শুকচাঁদ। খাওয়া-দাওয়া সারা হয়ে গেছে। পোঁটলা-পুঁটলি বাঁধা-ছাঁদার তোড়-জোড় চলছে। মাঝে মাঝে স্বামীর কাছে ধমক খাচ্ছে সিন্দুর। অমনিতে চালাক-চতুর হলে হবে কি, শহরে যাবার নাম শুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেছে। গাঁটরির ভিতরে এটা দিচ্ছে তো ওটা দিতে ভুলে যাচ্ছে। একটা কাজ করতে একবার এগুচ্ছে তো আর একবার পেছুচ্ছে! ভরত অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'না, তোর জ্বালায় আর পারি না। নৌকায় উঠতে উঠতে সন্ধ্যা হয়ে যাবে। নড়তে চড়তে ছ'মাস।'

কিন্তু ভরত না বুঝুক শুকচাঁদ বুঝেছে। কেন এত দ্বিমনা হয়েছে সিন্দুর, নড়তে চড়তে বাঁধা-ছাঁদার কেন এত দেরি হচ্ছে তার। মাঝে মাঝে মুচকি হেসে তাকাচ্ছে সে সিন্দুরের দিকে। অবশ্য চোখে চোখ পড়বা মাত্র সিন্দুর চোখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। কিন্তু চোখ ফিরিয়ে নিলেই কি শুকচাঁদের চোখ থেকে সহজে কেউ কিছু লুকোতে পারে। তার বুঝতে বাকি নেই। সিন্দুরের এক পা উঠেছে আর এক পা রয়েছে গর্তের মধ্যে। সে গর্ত খুঁড়ে রেখেছে গেঁজেল হতভাগা কেশব ভুঁইমালী। সিন্দুরের এক মন যাই যাই করছে আর এক মন লুটিয়ে পড়ে থাকতে চাইছে এ গাঁয়ের কাদা মাটিতে। মেয়েদের হৃদয় মনের কথা অনেক জানে শুকচাঁদ। বন্ধু ভরত তার কাছে এ ব্যাপারে একেবারে শিশু। তাকে বেশি জানিয়ে লাভ নেই, বেশি জানালে সে হজম করতে পারবে না। কেবল সুযোগ সুবিধামত আড়ালে আবডালে সিন্দুরকে জানিয়ে রাখতে হবে যে শুকচাঁদ জানে এসব গোপন রহস্য।

স্ত্রীকে বকছে বলে তার পক্ষ নিয়ে বন্ধুকেই বরং একচোট গাল দিল

শুকচাঁদ, 'থাম, থাম, খুব সোয়ামীপনা দেখানো হচ্ছে, না? সিন্দুর কি এর আগে কোথাও গেছে এসব কোনদিন করেছে যে আজ চটপট সব করে দেবে? নিজের কথা মনে নেই? দু'বছর আগে নিজে কেমন ছিলি একবার ভেবে দেখ দেখি। ডাইনে বললে দিশেহারা হয়ে বাঁয়ে যেতি, বাঁয়ে বললে ডাইনে।'

ঘরের ভিতর যখন গোছ-গাছ চলছে সিন্দুরদের, সামনা-সামনি পূবের পোতায় নিজের ঘরের দাওয়ায় বসে গগন ঢুলী নিঃশব্দে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল মেয়ে জামাইয়ের শহরে যাওয়ার আড়ম্বর আয়োজন। লক্ষ্মী এরই মধ্যে বার কয়েক তাকে তাগিদ দিয়ে গেছে নাইতে যেতে। গগন বিরক্ত স্বরে জবাব দিয়েছে, 'ঢং করিস নে মাগী, থাম্। আমি কোনদিন এত সকাল সকাল নাইতে যাই যে আজ যাব। ছেলেপুলে তো খেয়েছে তোর যদি পেটে আগুন জ্বলতে থাকে তুই বরং খেতে বস গিয়ে, আমার মোটেই খিদে নেই।'

স্বামীর মেজাজ দেখে লক্ষ্মী আর কথা বাড়াতে সাহস পায় নি। ফের গিয়ে ঢুকেছে ঘরে।

কিন্তু দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে হবে কি, ফের আবার স্ত্রীকে ডাকাডাকি শুরু করেছে গগন। আজ যেন একটি মুহূর্তও একলা থাকবার তার সাধ্য নেই। লক্ষ্মী চলে যাওয়ার একটু বাদেই ডাকাডাকি শুরু করল গগন।

'সত্যি সত্যিই গিলতে বসলি নাকি ও বউ। বসবি তো বসবি। তার আগে আমার এই কলকেটায় একটু আগুন দিয়ে যা।'

লক্ষ্মী সাড়া দিল না, কিন্তু উনুন থেকে ছাই তুলে হাতায় করে কয়েক টুকরো জ্বলন্ত অঙ্গার নিয়ে এসে স্বামীর সামনে দাঁড়াল। তারপর কলকেটির দিকে একটু তাকিয়ে বলল, 'আবার তামাক? এই একটু আগেই না তামাক খেলে তুমি? হয়েছে কি বল দেখি। ডিবার সব তামাক এ বেলার মধ্যে শেষ করে ফেলবার মতলবে আছ বুঝি?' বলতে বলতে খানিকটা আগুন কলকেতে ঢেলে দিল লক্ষ্মী।

ডান হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা দিয়ে অদ্ভুত কৌশলে জ্বলন্ত অঙ্গারের দুটো টুকরো আরও ছোট ছোট টুকরোয় ভেঙে নিল গগন। তারপর বাঁশের খুঁটিতে ঠেস দেওয়া হুঁকোটা টেনে নিয়ে তার মাথায় কলকে বসাতে বসাতে বলল, 'হুঁ'। কলকে বসিয়েই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টানতে শুরু করল না গগন, অন্যমনস্ক ভাবে স্ত্রীর মুখের দিকে একটুখানি তাকিয়ে থেকে হঠাৎ বলল, 'দেখলি মেয়ে জামাইর কাণ্ডটা? আক্কেল দেখলি ওদের?'

লক্ষ্মী শান্ত স্বরে বলল, 'দেখলাম তো, কিন্তু দেখে কি করব বল।'

গগন গর্জে উঠল, 'কি করবি মানে? ওরা কি হাতীর পাঁচ পা দেখেছে, না লাটসাহেব হয়েছে শুনি যে এত হেলা হেনস্তা আমাকে? আমি কি মরে গেছি, না অথর্ব শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছি যে একটুও কেয়ার করবে না ওরা আমাকে? এতকাল কার ভিটায় বাস করেছে শুনি। কার আম জাম নারকেল সুপুরি বাঁশে বেতে ভাগ বসিয়েছে? এর আগে সতীনের মেয়ের সঙ্গে খুব তো সখি সখি ভাব দেখেছি তোর। যা একবার জিজ্ঞেস করে আয় দেখি।'

সিন্দুরের আচরণটা লক্ষ্মীরও ভাল লাগে নি। সিন্দুরের সঙ্গে সে তো কোন খারাপ ব্যবহার করে নি, বরং তার কথা মতই চলেছে ফিরেছে, সম্পর্কে মা হয়েও সমবয়সী সখির মত হাসি-ঠাট্টায় যোগ দিয়েছে। কিন্তু শহরে যাওয়ার সুযোগ পাওয়ায় এত দেমাক বেড়েছে সিন্দুরের যে ভাল করে তাকে একবার জিজ্ঞাসা করবারও দরকার মনে করে নি। লক্ষ্মীর সঙ্গে যেন একটা কথা বলবারও সময় নেই সিন্দুরের। একবার অবশ্য ডেকেছিল পোঁটলা-পুঁটুলি বাঁধার কাজেই সাহায্য করতে, কিন্তু সেই ভাবটা যে নিতান্তই লোক দেখানো তা লক্ষ্মীর বুঝতে বাকি থাকে নি। খানিক আগে সিন্দুরের ঘরের কাছাকাছি গিয়ে ঘরের মধ্যে শুকচাঁদের গলা আর হাসির শব্দ শুনে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি ফিরে এসেছে। সিন্দুর যদি সত্যি সত্যিই কাজকর্মে লক্ষ্মীর সাহায্য চাইত তাহলে শুকচাঁদকে আর ঘরের মধ্যে বসিয়ে রাখত না, সিন্দুর তো জানে লোকটিকে লক্ষ্মী পছন্দ করে না। শুকচাঁদের তাকাবার ভঙ্গি, হাসির ভঙ্গি, কথা বলবার ধরণ সবই খারাপ লাগে লক্ষ্মীর কাছে। আর খারাপ লাগে বলেই পারতপক্ষে শুকচাঁদের সামনে সে বেরোয় না, কি করে সিন্দুরেরা তার সঙ্গে বন্ধুত্ব রেখেছে তা তারাই জানে। অমন লোককে ঘরের মধ্যে ডেকে বসানো তো দূরের কথা, লক্ষ্মী তাকে বাইরের দাওয়ায় পর্যন্ত বসতে দিতেও রাজী নয়।

গগন আরও একবার তাড়া দিল, 'সঙের মত দাঁড়িয়ে রইলি কেন অমন করে। যা গিয়ে জিজ্ঞেস করে আয়।'

লক্ষ্মী বলল, 'দরকার থাকে তুমি জিজ্ঞেস কর গিয়ে। আমি পারব না।'

গগন স্ত্রীর অবাধ্যতায় চটে উঠে বলল, 'তা পারবি কেন! আসলে তোর যে খুব আনন্দ হয়েছে, তা কি আর বুঝতে পারছি নে আমি?

সতীনের মেয়ে নেমে যাচ্ছে বাড়ির ওপর থেকে, তোর আহ্লাদের আর সীমা আছে কই।'

মিথ্যা দোষারোপে লক্ষ্মীর চোখ ছলছল করে উঠল, বলল, 'এতকাল বাদে তুমি এই কথা বললে আমাকে? সতীনের মেয়ে বলে কোনদিন সিন্দুরকে আমি কুনজরে দেখছি না কুব্যবহার করেছি তার সাথে সত্যি করে বল দেখি? ঘরের তলায় বসে বলতো আমার গা ছুঁয়ে।'

কিন্তু ঘরের তলায় এক মুহূর্তও আর বসে রইল না গগন। ধীর সুস্থ ভাবে তামাক খাওয়ারও তার সময় হল না। কেননা ঘরে তালাচাবি দিয়ে মোট-ঘাট পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে সিন্দুররা ততক্ষণে উঠানে নেমেছে। তাই দেখে গগনও দাওয়া থেকে তড়াক করে লাফ দিয়ে উঠানে গিয়ে পড়ল।

শুকচাঁদ হেসে উঠে বলল, 'বুড়ো বয়সে ওকি লাফালাফি শুরু করে দিলে ঢুলীর পো। হাত পা ভেঙে যাবে যে।'

গগন রুখে দাঁড়িয়ে বলল, 'কার সাধ্য আমার হাত পা ভাঙে একবার দেখি।'

শুকচাঁদ বলল, 'আরে আর কেউ কি আর ভাঙতে যাচ্ছে। নিজের দোষেই নিজের হাড়গোড় চুরমার করে ফেলবে তুমি।'

গগন বলল, 'নিজের দোষে। খুব একজন বুদ্ধিমানের কথা বললে বটে, বাহারের বিচার করলে একখানা। জাতে ভুঁইমালী তো, ঘটে এর চেয়ে বেশি বুদ্ধি আর ধরবে কি করে। কোলে পিঠে করে বড় করলেম মা মরা মেয়েকে, বিয়ে থা দিলাম। সে আজ ধেই ধেই করে সোয়ামীর সঙ্গে শহরে চলেছে। যাওয়ার আগে জিজ্ঞাসাটা পর্যন্ত করল না একবার। জামাইকে নিজের বাড়ির ওপর এনে গাঁটের কড়ি খরচ করে ঘর তুলে দিলাম, হাতে ধরে শেখালাম ঢোল সানাই, সে একবার চেয়েও দেখল না। দোষ তো আমারই। ভুঁইমালীর ছেলে ছাড়া এমন কথা আর বলবে কে।'

এক মুহূর্ত কারও মুখে কোন কথা বেরুল না। একটু বাদে ভরত শুকচাঁদের দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল হে চাঁদ, দুপুর গড়িয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করে দরকার নেই। ওসব খোঁটা অনেক শুনেছি, জবাব দিতে গেলেই তো ঝগড়া হবে। এক জায়গায় যাওয়ার মুখে কারও সঙ্গে ঝগড়া-ঝাঁটি করে না যাওয়াই ভাল, চল।'

শেষের নির্দেশটা আদেশের ভঙ্গিতে স্ত্রীকেই দিল ভরত।

রঙীন ডুরে-কাটা শাড়িখানা পরেছে সিন্দুর। একটু পুরোনো হলেও মানিয়েছে বেশ, হাতে ধবধব করছে রূপার চুড়ি আর সরু শাঁখা। সবুজ রঙের এক গোছা করে কাঁচের চুড়িও সেই সঙ্গে পরে নিয়েছে। স্বামী আর বাপ দুজনেই সামনে রয়েছে বলে একটু বাড়িয়ে দিতে হয়েছে ঘোমটাটা।

স্বামীর নির্দেশে একটু এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে বাপের পায়ের ধুলো নিতে গেল সিন্দুর।

'খবরদার, খবরদার' তাড়াতাড়ি দু'পা পিছিয়ে গেল গগন, 'আমার পা ছুঁসনে হারামজাদী, অমন লোক দেখানো ভক্তির দরকার নেই আমার।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘোমটাটা খানিকটা খাটো হয়ে গেল সিন্দুরের, গলাটা চড়ে উঠল, 'কেন কি দোষ করেছি যে যাওয়ার সময় একবার পায়ের ধুলো নিতে দেবে না বাবা।'

গগন গর্জে উঠল, 'ঈস, সোহাগ দেখ। বাবা বাবা। কে রে তোর বাবা, হারামজাদীর বেটি হারামজাদী। আমার মেয়ে নাকি তুই? আমার মেয়ে হলে অন্য রকম হতিস, বুঝলি? এমন নচ্ছার বদমাস বেইমান হতিস নে।'

বলতে বলতে কি মনে করে হঠাৎ থেমে গেল গগন। তারপর জিভ কেটে দু'হাত বাড়িয়ে সিন্দুরকে নিজের বুকের মধ্যে টেনে নিতে গেল। কিন্তু সিন্দুর তখন হাত কয়েক পিছনে সরে দাঁড়িয়েছে।

চেঁচামেচি শুনে আশেপাশের প্রতিবেশীরা দু'চারজন এসে পড়েছে ততক্ষণে। এসেছে যাদব রামলাল, বরলাল, ভুঁইমালীদের অশ্বিনী এসেছে ছোট মেয়েকে কোলে করে। গগনের কথা শুনে সবারই মুখেই হাসির ঝিলিক দেখা গেল।

এদের মধ্যে অশ্বিনীরই কেবল চল্লিশের কাছাকাছি বয়স, সে মুচকি হেসে বলল, 'আহাহা হল কি তোমার খুড়ো, মাথা কি খারাপ হল তোমার? ঘরের হাঁড়ি হাটের মধ্যে কেউ ভাঙে তোমার মত, এ্যাঁ?'

'এই অশ্বিনীদা, চুপ! আর একটা কথা বললে জিভ টেনে উপড়ে ফেলব তোমার। বুড়ো মানুষ, রেগে মেগে, নিজের মেয়েকে শাসন করেছে, তার আবার হাঁড়ি ভাঙাভাঙি কি।' কর্কশ, বাঁজখাই আওয়াজে কে চেঁচিয়ে উঠল। অবাক হয়ে সবাই পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল গেঁজেল কেশব ভুঁইমালী। ওই তো রোগা পটকা ছিপছিপে চেহারা। তার মধ্যে এত বড় বাজের

আওয়াজ লুকিয়ে ছিল কে জানতো। এর আগে কেশবকে এত জোরে কেউ কথা বলতে শোনেও নি।

ঘোমটার ভিতর থেকে সিন্দুর একবার তাকাল কেশবের দিকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে নিল তাড়াতাড়ি। পাছে আর কেউ দেখে ফেলে। জোয়ান জবরদস্ত চেহারা অশ্বিনীর। গায়ে শক্তিও খুব। তার কাছে কেশব পোকা মাকড়ের মত। কেশবের বিক্রম দেখে রাগের চেয়ে কৌতুক বোধই বেশি হল অশ্বিনীর, বলল, 'তাই নাকি কেশব? উপড়াবি নাকি আমার জিভ। দেখ দেখি চেষ্টা করে কতদূর পারিস।' বলে সত্যিই অশ্বিনী খানিকটা জিভ বের করে ফেলল। তার ভঙ্গি দেখে কেউ না হেসে পারল না। হাসল না কেবল সিন্দুর, ভরত আর গগন নিজে।

কেশব বলল, 'বেশ, বেশ অশ্বিনীদা। যেটুকু বের করেছ দাঁত দিয়ে এবার কেটে ফেল। তোমার শক্তি আমার চাইতে অনেক বেশি। আমার হাতের চেয়ে ঢের বেশি তোমার দাঁতের জোর।'

এবারও হেসে উঠল যাদবেরা।

ভরত গম্ভীর স্বরে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'চল ঢের হয়েছে, কাজ নেই আর দাঁড়িয়ে থেকে।'

কিন্তু গগন ফের জামাইয়ের সামনে গিয়ে পথ আটকে দাঁড়াল। কিছুমাত্র লজ্জা সংকোচ নেই গগনের। যেন খানিক আগে কিছুই ঘটে নি কোন রকম বেফাঁস কথা বেরোয় নি তার মুখ থেকে। ভরতের পথ আটকে গগন বেপরোয়াভাবে বলল, 'ঈস, চল বললেই হল আর কি, আমার পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে তবে পা বাড়াবি নইলে ও পা আমি আস্ত রাখব না।'

শুকচাঁদ সিন্দুরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আহাহা, রাগে আর গরমে তোমার বাবার তো একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে দোস্তানী, তোমার ছোট মাকে ডেকে দাও, দু'চার কলসী জল এনে ঢেলে দিক মাথায়।' তারপর গগনের দিকে চেয়ে বলল, 'মোটেই ভেব না খুড়ো, তোমার পাওনা-গণ্ডা ভরত শহরে গিয়ে এক মাসের মধ্যে মনি-অর্ডার করে পাঠাবে। পাইপয়সাটিও বাকি রাখবে না, আমরা জামিন রইলাম।'

গগন বলল, 'ঈস, ধরণ দেখ কথার, কত বড় জামিনদার জুটেছে। চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা।'

সিন্দুর শান্ত স্বরে বলল, 'কিন্তু আমি যদি জামিন থাকি বাবা—'

গগন বলল, 'থাক, কিছু চাই নি তোদের কাছে।'

ঘাটের দিকে, ক্রুদ্ধ গগনও তার পিছনে পিছনে ছুটে যাচ্ছিল কিন্তু যাদব আর রামলাল তাকে জোর করে ধরে রাখল, বলল, 'আঃ মোড়ল, সত্যিই কি মাথা খারাপ হল নাকি তোমার, যাও ঘরে যাও, দুপুর গড়িয়ে গেছে। খাওয়া-দাওয়া কর গিয়ে, যাও। ভেব না, সানাইএর জন্যে আমাদের বায়না আটকে যাবে না। সানাই আমরা যে ভাবেই হোক একটা জুটিয়ে নিতে পারব।'

ভরত স্ত্রীকে বলল, 'চল।'

সিন্দুর বলল, 'তুমি এগোও, আমি লক্ষ্মীকে একটা কথা বলে আসি।'

ভরত বিরক্ত স্বরে বলল, 'এরপরও ওদের সঙ্গে কথা বলা বাকি থাকে তোমার, কথা বলার ইচ্ছা আর হয়?'

স্বামীর এ প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই বাপের ঘরের মধ্যে ঢুকে গেল সিন্দুর।

উঠানের ভিড় তখন প্রায় ভেঙে গেছে। শুকচাঁদের পিছনে পিছনে প্রায় সকলেই এগিয়ে গেছে নদীর দিকে, কেবল যায় নি ভরত। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্ত্রীর জন্যে সে অপেক্ষা করতে লাগল। রাগে আর বিরক্তিতে থমথম করতে লাগল তার মুখ।

সিন্দুর কিন্তু খুব দেরি করল না, একটু বাদেই বেরিয়ে এল গগনের ঘর থেকে। পিছনে পিছনে লম্বা ঘোমটায় মুখ ঢেকে চলল লক্ষ্মী, পাড়া পড়শী আরও কয়েকটি ঝি-বউ সঙ্গে সঙ্গে চলল। তারা সিন্দুরকে নদীর ঘাট পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে।

মোট-ঘাট নিয়ে শুকচাঁদ আগেই উঠে বসেছে নৌকোয়। ভরতও গিয়ে ঢুকল। পা ধুয়ে নৌকোয় উঠবার আগে গলুইতে একবার নিচু হয়ে মাথা ছোঁয়াল সিন্দুর। জল হল দেবতা, নৌকো হল দেবতা, প্রণাম করে না নিলে অপরাধ হবে যে। তারপর খাটো ঘোমটার ফাঁকে ছলছল চোখে তাকাল একবার ঘাটের দিকে।

চেনা জানা ছোট বড় প্রায় সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ঘাটে। এসেছে, অশ্বিনী কার্তিক যাদব রামলালেরা, শুকচাঁদের মা, বউ, এমন কি রাসী বোষ্টমীকেও দেখা যাচ্ছে মেয়েদের মধ্যে, নেই কেবল কেশব। একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে রাখল সিন্দুর। আর নেই তার বাবা। খানিক আগে রাগের

মাথায় যা তা বলে ফেলে এখন বোধ হয় সত্যিই সে অনুতপ্ত হয়েছে। ঘর থেকে বেরিয়ে মুখ দেখাতে পারছে না লজ্জায়।

কিন্তু নৌকো ভাসাতে না ভাসাতেই দেখা গেল নদীর পাড় দিয়ে নৌকোর সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আসছে গগন, 'ও মাঝি, ও মাঝি, নৌকো থামাও তোমার, একটু থামাও।'

ইয়াসিন চটে উঠে চিৎকার করে বলল, 'কেন, হয়েছে কি। নাও ভাসিয়েছি কি থামাবার জন্যে।'

ছইয়ের বাইরেই বসে ছিল শুকচাঁদ। ইয়াসিনকে নৌকো থামাতে বলে পাটাতনের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ব্যাপার কি ঢুলী খুড়ো। কিছু বলবে নাকি তুমি।

গগন ততক্ষণে নৌকোর কাছাকাছি এসে পৌঁছেছে, বলল, 'হ্যাঁ বাবা, একটা কথা বলবার জন্যেই এতদূর দৌড়ে এসেছি আমি। না সানাইর কথা নয়। তার ব্যবস্থা যাদব করতে পারে করবে, না পারে না করবে। সানাইর কথা নয়, সিন্দুরের কথা। সিন্দুরকে কিন্তু তোমার ভরসায়ই শহরে যেতে দিচ্ছি, আমার জামাইর ভরসায় নয়। জামাই কেবল গোয়ার্তুমি করতেই জানে, বুদ্ধি বিবেচনার ধার ধারে না। ভুঁইমালীর ছেলে হলে হবে কি তুমি, অনেক বেশি বুদ্ধি রাখ। দেখ, যেন কোন বিপদ-আপদ না হয় আমার সিন্দুরের।'

শুকচাঁদ একটু হেসে বলল, 'না না, বিপদ-আপদের কি আছে?'

গগন বলল, 'আছে বাবা আছে, শহর বড় সাংঘাতিক জায়গা। ভারি ডরাই আমি শহরকে।'

শুকচাঁদ বলল, 'না না ডরাবার কিছু নেই। কলকাতার মত শহর তো নয়, যে গাড়ি ঘোড়ার খুব উৎপাত থাকবে। ছোট খাট বন্দর, ভয় কি?'

গগন বলল, 'তা হোক বাপু। বড় সাপও সাপ, ছোট সাপও সাপ, বিষ একটু একটু সবারই মধ্যে আছে, তোমরা খুব সাবধানে থেকো। আর বাসা-বন্দর যদি না পাও এই নৌকোতেই ফিরিয়ে নিয়ে এস আমার সিন্দুরকে।'

শুকচাঁদ বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, তাতো আসবই। সেজন্যে ভাবনা নেই তোমার।'

ছইয়ের ভিতর থেকে সিন্দুর মুখ বাড়িয়ে তাকাল বাপের দিকে, কে বিশ্বাস

করবে এই গগনই খানিক আগে তাদের সঙ্গে ঝগড়া করেছে, বেজন্মা বলে গাল দিয়েছে নিজের মেয়েকে।

গগন বলল, 'খুব সাবধানে থাকিস সিন্দুর, বুঝলি।'

সিন্দুরের চোখ ঝাপসা হয়ে এল, ভিজে গলায় বলল, 'থাকব বাবা, তুমি বাড়ি যাও এবার।'

বদ মেজাজী ইয়াসিন বলল, 'হ্যাঁ এবার বাড়ি যাও ঢুলীর পো। নইলে আজ রাতের মধ্যেও সাড়ে সাতকাঠিতে গিয়ে নৌকো ভিড়াতে পারব না আজ।'

লগির খোঁচায় নৌকো ফের ভাসিয়ে দিল ইয়াসিন। খানিকবাদে বাঁকের আড়ালে গগনকে আর দেখা গেল না। সিন্দুর তবু ঘোমটা তুলে তাকিয়ে রইল বাইরের দিকে, নৌকোর সঙ্গে সঙ্গে গগন ছাড়া আর কেউ কি ছুটে আসবে না? সিন্দুরকে কিছু বলবার কথা কি মনে পড়বে না আর কারও?

বাড়িতে পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বুকের ভিতরটা খাঁখাঁ করে উঠল গগনের! সমস্ত বাড়িটা যেন শূন্য হয়ে গেছে। অথচ বিন্দুর ছাড়া সবাই তো আছে বাড়িতে, আছে দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লক্ষ্মী, ছোট দুই মেয়ে ময়না, মলুঙ্গী। কিন্তু সিন্দুর বিহনে সব অন্ধকার।

বাপের সঙ্গে এতদিন যে সরিকীআনা করে এসেছে সিন্দুর, তা আর গগনের মনে পড়ল না। জামাই যে তাকে সত্যি সত্যিই গগনের কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। এই দুঃখই তার মনে প্রবল হয়ে উঠল। মনে পড়ল মা-মরা মেয়েকে পাছে চোখের আড়াল করতে হয় সেই আশঙ্কায় অল্প বয়সে মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইকে ঘরজামাই করে রেখেছিল গগন। তারপর বড় হয়ে মেয়ে-জামাইয়ের ব্যবহারে গগনের প্রায়ই মনে হত যে ওরা চোখের আড়ালে গেলেই সে বাঁচে। মেয়ে তো নয় পুরোপুরি সরিক হয়ে দাঁড়িয়েছিল সিন্দুর। গাছের ফল নিয়ে শুকনো ডাল-পাতা নিয়ে কত যে সে কোন্দল করেছে গগনের সঙ্গে আর লক্ষ্মীর সঙ্গে, তার ঠিক নেই। মেয়ের ওপর আক্রোশ বিদ্বেষের অন্ত ছিল না গগনের। কিন্তু আজ সিন্দুরের ঘরের

সামনে তালা ঝুলতে দেখে সেই সব হিংসা বিদ্বেষের পরিবর্তে মন অদ্ভুত এক মমতায় ভরে উঠল। বাসাবাড়ি না ঠিক করে গোঁয়ার-গোবিন্দ জামাই কোথায় মেয়েটাকে টেনে নিয়ে ওঠাবে কে জানে? না জানি কত কষ্টই হবে সিন্দুরের। এ ব্যাপারে অভিমান করে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখে গগন ভারি বেয়াকুবী করে বসেছে। এর চেয়ে ধমক দিয়ে মেয়ে-জামাইকে থামানোই তার উচিত ছিল। নৌকোর গলুই ধরে টেনে রাখলেই বা তাকে আটকাত কে।

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘন হয়ে এসেছে। গগনের দ্বিতীয় পক্ষের বড় মেয়ে ময়না এসে জিজ্ঞাসা করল, 'বাবা, ঠিক ঠিক সন্ধ্যা হয়েছে তো? আলো জ্বালব ঘরে?'

সন্ধ্যার সময় সন্ধ্যাদীপ জ্বালতে হয়। কিন্তু গগনের বাড়িখানা গাঁয়ের ভিতরের দিকে আর গাছগাছালিতে ঘেরা বলে সন্ধ্যার আগেই ঘরের মধ্যে অন্ধকার জমাট বাঁধে। দু'চোখে কিছু দেখা যায় না বলে অন্ধকার হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে আলো জ্বালত লক্ষ্মী। কিন্তু গগনের সেটা সহ্য হত না! গরীবের এত চেকনাইয়ের দরকার কি। তেলের দাম দিনের পর দিন চড়ে যাচ্ছে বাজারে। লক্ষ্মী বলত, 'ছেলেপুলে নিয়ে বাস। গরীব বলে কি সন্ধ্যার সময় দীপও জ্বালব না ঘরে। গেরস্থের মঙ্গল অমঙ্গল বলেও তো কথা আছে একটা।'

গগন বলত, 'দীপ জ্বালবি, সন্ধ্যার সময় জ্বালবি। সন্ধ্যার দু'দণ্ড আগে চেরাগ জ্বেলে বসে থাকবার মত অবস্থা আমার নয়, আঁধার হলেই সন্ধ্যা হয় না, তার একটা ক্ষণ আছে, সময় আছে। বাইরে একটু খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দেখ কত দেরি সন্ধ্যার।'

তেলের হিসাবের বেলায় যত বাড়াবাড়ি করে গগন, মাছ-তরকারির বেলায় তেমন করে না। প্রদীপে তেল পোড়ে, রাঁধা-বাড়ায় তেলের দরকার হয়, মাথায় মাখবার জন্যেও নারকেলের তেল একটু বেশিই খরচ হয় লক্ষ্মীর। আর যে কোন তেল আনতে বললেই গগনের কাছে ধমক খেতে হয়। একটু বেশি সময় ঘরে প্রদীপ জ্বালা দেখলে গগনের সহ্য হয় না। প্রদীপে তেল পোড়ে না তো যেন বুক পোড়ে গগনের। তাই সন্ধ্যাদীপ জ্বালবার আগে মাঝে মাঝে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করে লক্ষ্মী, 'ঘরে অন্ধকার হয়েছে। দীপ জ্বালাবার সময় হল কি না বলে দাও, দুচোখে কিছু দেখা যাচ্ছে না।'

গগন বলত, 'তা যাবে কেন। তোর চোখের একটু বড়লোকীপনা আছে কিনা।'

লক্ষ্মী জবাব দিত, 'তা তো আছেই। মানুষ না হয়ে যদি কুকুর বিড়াল হয়ে জন্মাতাম তাহলেই ভাল হত। অন্ধকারে নিজের চোখেই জোনাকি জ্বলত, আলো আর জ্বালতে হত না ঘরে।'

কিন্তু আজ ঠাট্টা-তামাসা নয় বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়েই ময়নাকে স্বামীর কাছে আলো জ্বালবার অনুমতি নিতে পাঠিয়েছিল লক্ষ্মী। আহা, প্রাণ পুড়ছে মানুষটির মেয়ের জন্যে। ময়নার সঙ্গে কথাবার্তায় তবু একটু ভুলে থাকবে, আনমনা হয়ে থাকবে।

ফল হল বিপরীত। আলো জ্বালবার কথা জিজ্ঞাসা করতেই গগন খেঁকিয়ে উঠল, 'চোখ নেই তোদের সঙ্গে? সন্ধ্যা হয়েছে কি হয় নি নিজেরা দেখতে পাস নে?'

মুখ ভার করে মায়ের কাছে ফিরে এল ময়না, বলল, 'বকুনি খাব জান কিনা, তাই আমাকে পাঠিয়েছ। তা না হলে নিজেই যেতে। তুমি গেলে তো বেশ হেসে হেসে কথা বলে বাবা, যত ধমকানি আমার বেলায়।'

লক্ষ্মী হাসি চেপে বলল, 'হয়েছে হয়েছে, একেবারে বুড়ী ঠাকরুণ। মেয়ে তো নয়, আমার মরা মা যেন ফিরে এসেছে।'

ধীরে সুস্থে দীপ জ্বালল লক্ষ্মী, তারপর খুব যত্ন করে এক ছিলিম তামাক সেজে স্বামীর কাছে গিয়ে দাঁড়াল, 'নাও তাড়াতাড়ি, আগুন নিবে যাবে।'

স্ত্রীর তোয়াজে মেজাজটা একটু নরম হল গগনের। হাত বাড়িয়ে হুঁকোটা নিয়ে টানতে শুরু করল। একটু চুপ করে থেকে লক্ষ্মী বলল, 'মন খারাপ করে লাভ কি বল। এতকাল তো চোখের ওপরই রেখেছিলে মেয়েকে, দু'দিনের জন্যে না হয় দূরেই গেছে একটু, তাই বলে মন-মেজাজ খারাপ করতে হয় নাকি।'

গগন মুখ খিঁচিয়ে উঠল, 'মন খারাপ হয়েছে কে বললে তোকে।'

লক্ষ্মী হাসি চেপে বলল, 'পাড়ার পাঁচজনে এসে দেখে গেছে। নিজের মুখ তো আর নিজের চোখে দেখতে পাও না। মানুষের মন খারাপের কথা কি কারও বলবার দরকার হয়—না শোনবার দরকার হয়। মানুষের মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায় তার মন কেমন আছে না আছে,—মন-মেজাজ যদি খারাপই না হবে মেয়েটাকে অমন করে বকলে কেন?'

গগন বলল, 'বকেছি বেশ করেছি। তুই বুঝি তাই কৈফিয়ত নিতেই এসেছিস! ছেলেবেলাতেই বকে ধমকে ওদের ঠিক রাখতে হয়। না হলে বড় হয়ে হাজার বকুনিতেও আর শোধরায় না। চোখের ওপর দেখলি তো সিন্দুরকে। ছেলেবেলায় কম আদর-যত্ন করেছি হারামজাদীকে। খাওয়ানোয় পরানোয় কোনটায় এতটুকু কমতি পড়তে দিই নি। এত আদর-সোহাগ ওর বড় লোক বাপও কোনদিন করতে পারত না।'

লক্ষ্মী মৃদু তিরস্কারের স্বরে বলল, 'আঃ, ফের মুখ খারাপ করতে শুরু করলে?' কিন্তু তিরস্কারটা যে ভান মাত্র তা লক্ষ্মীর পরের কথাটুকুতেই ধরা পড়ল। স্বামীর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী গলা নামিয়ে বলল, 'হ্যাঁ গো, লোকে তাহলে যা বলে সে সব সত্যি?' গলা চাপা হলেও কৌতূহলটা লক্ষ্মী কিছুতেই চেপে রাখতে পারল না।

গগন নিস্পৃহ স্বরে বলল, 'অত ফিসফিস করছিস কেন। সব সত্যি। সিন্দুরের মার মতিগতি খুব যে খারাপ ছিল তা নয়, কিন্তু সঙ্গ দোষে মানুষ নষ্ট। আর এ তো যে সে মানুষের সঙ্গ নয় বড় মানুষের সঙ্গ। ভুবন চৌধুরীর মত সুন্দর আর সৌখীন পুরুষ তখন গাঁয়ে আর ছিল না। সিন্দুরের মা তুলসী তো তুলসী, ভাল ভাল কত বামুন-কায়েতের মেয়ে তার চোখ এড়াতে পারে নি, হাত এড়াতে পারে নি।'

লক্ষ্মী একটু চুপ করে থেকে বলল, 'সিন্দুর বুঝি সেই—। অবস্থা, তুমি যখন জানতে পারলে তখন রাগ হল না তোমার?'

গগন বলল, 'হল বই কি। সে কি যে সে রাগ? আমার খুন চেপে গেল মাথায়। ভাবলাম দুটোকেই শেষ করব। আগে পর তারপরে ঘর।'

লক্ষ্মী বলল, 'ও বাবা! দেখ দেখ, আমার গায়ের লোম কিরকম খাড়া হয়ে উঠেছে দেখ। তারপর?'

গগন মৃদু হাসল, 'গায়ের লোম খাড়া হওয়ার পরেও তোর শুনবার সাধ মিটছে না? ওই রকমই হয়। তারপর আর করে উঠতে পারি নি, তাহলে তো ফাঁসী দ্বীপান্তরই হত। তুই বেঁচে যেতিস, বুড়ো সোয়ামীর ঘর আর তোকে করতে হত না।'

লক্ষ্মী বলল, 'আহাহা, ছিরি দেখ কথার। বুড়ো সোয়ামীর ঘরে যেন দুঃখে আমি একেবারে মরে আছি। তাছাড়া তুমি ফাঁসী গেলেই কি বুড়ো সোয়ামীর কপাল আমার বদলে যেত? কপালে যখন এই লেখা আছে, তখন তোমার

হাতে না পড়লেও আর এক বুড়োর হাতে গিয়ে পড়তাম। দেশে তো আর অভাব নেই বুড়োর। কিন্তু খুন কেন করতে পারলে না।'

গগন বলল, 'কি করে পারব। খুন করতে গিয়ে দেখি ভগবান আগেই তাকে খুন করে রেখেছেন। থানার দারোগার সাথে ভারি দোস্তী ছিল চৌধুরীবাবুর। মদ মাংসের পাল্লা চলত দু'জনের মধ্যে। একবার সেই পাল্লায় চৌধুরীবাবু জিতে এল। কিন্তু এসে আর দাঁড়াতে পারল না উঠে। রক্ত ছুটল গলা দিয়ে। দোষ না কি আগেই একটু-আধটু ছিল। বাস সপ্তাহ-খানেকের মধ্যেই কাম ফতে।'

গগন হুঁকোতে গোটা দুই টান দিয়ে বাঁশের খুঁটিতে সেটা ঠেস দিয়ে রেখে একটুখানি চুপ করে রইল।

খানিকক্ষণ চুপ করে রইল লক্ষ্মীও। তারপর বলল, 'যা শত্রু পরে পরে। আপনা থেকেই শত্রু নিপাত হল দেখে মনে বুঝি ভারি ফুর্তি হল তোমার?'

গগন বলল, 'দূর। এতদিন ঘর-সংসার করলি পুরুষমানুষের সঙ্গে, কিন্তু তার মনের নাগাল একটুও ধরতে পারিস নি বউ। ফুর্তি? কত গালাগাল দিয়েছি, কত শাপ-মণ্যি করেছি চৌধুরীকে, কতবার কতরকম চেষ্টা করেছি তাকে সরিয়ে ফেলতে কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজে থেকেই যখন সে সরে গেল, ফুর্তি কি বলছিস তুই দুঃখে যেন বুক ফেটে যেতে লাগল আমার। আহাহা অমন বাঘের মত পুরুষ—এরকম অপমৃত্যু তো আমি কোনদিন চাই নি।'

ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে ময়না আর মলুঙ্গী পুতুল খেলতে শুরু করেছে। তাদের কথাবার্তা আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে ভেসে আসছে দাওয়ায়। কিন্তু সেই সামান্য টুকটাক শব্দে এই ঘন অন্ধকারের স্তব্ধতার যেন কিছুমাত্র হানি হল না, খানিকক্ষণ চুপ করে থাকবার পর লক্ষ্মী আবার কথা বলল, 'কিন্তু সিন্দুর আর তার মাকে কি করে ক্ষমা করলে? ঘেন্না ধরল না মনে?'

গগন এবারও মৃদু একটু হাসল, 'পুরুষের মনের কথা তোকে বোঝাতে যাওয়া বৃথা ময়নার মা। পুরুষের ক্ষমা ঘেন্না সব আলাদা, ওসব তুই বুঝতে পারবি নে। তুই যা পারিস তাই কর। আর এক ছিলিম তামাক আন সেজে। একটু ভাল আগুন দিস দেখি। আগুন ভাল না হলে কি জুত হয় তামাক খেয়ে।'

'ঢুলী খুড়ো আছ নাকি, ঢুলী খুড়ো।'

কলকি হাতে লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠে গেল ঘরের মধ্যে।

গগন বলল, 'হ্যাঁ, আছি। কে কেশব? কি মনে করে? অন্ধকারে কেশবকে ভাল করে দেখা না গেলেও গলার শব্দে তাকে বেশ চিনতে পারল গগন। ঘরের ভিতরের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ও ময়নার মা, কলকেতে আগুন আনবার সময় কেরোসিনের ডিবেটাও নিয়ে আসিস, ওকি ও কিসে বসলি কেশব, নে, এই চেটাইখানা পেতে বস।'

একটু বাদে এক গলা ঘোমটা টেনে একহাতে কলকে আর একহাতে জ্বলন্ত একটা কেরোসিনের ডিবে এনে মেঝেয় নামিয়ে রেখে লক্ষ্মী ফের ঘরে গিয়ে ঢুকল। কিন্তু বেশীদূরে গেল না, বা অন্য কোন কাজেও হাত দিল না। দোরের আড়ালে দাঁড়িয়ে রইল কান পেতে।

এতক্ষণ আবছা আবছা দেখাচ্ছিল বলে গগন ঠিক ঠাহর করতে পারে নি, দীপের আলোয় এবার জিনিসটা পরিষ্কার দেখতে পেয়ে গগন চমকে উঠল, 'ওকি ও সানাই পেলি কোথায় তুই।'

কেশব শান্তভাবে বলল, 'সেই কথা বলতেই তো এসেছি। সানাই গোপনে আমাকে দিয়ে গেছে শুকচাঁদ। বলেছে পৌঁছে দিস ঢুলী খুড়োকে, এই নাও তোমার সানাই।'

গগন বলল, 'খবরদার, মিছে কথা বলিস নে কেশব, ও সানাই আমার নয়। ও সানাই ভরতের। ও আমি হাত দিয়েও ছোঁব না।'

কেশব অবাক্ হয়ে বলল, 'কেন ঢুলী খুড়ো?'

গগন তেমনি উত্তেজিত স্বরে বলল, 'কেন? সে কথা আবার জিজ্ঞেস করছিস তুই? কেন, আমার কি কোন মান অপমান নেই। যে সানাই আমার মেয়ে-জামাই আমাকে প্রাণ থেকে দিয়ে যেতে পারল না তা আমি লুকিয়ে চুরিয়ে অপরের কাছ থেকে নেব কেন? বলিস কি তুই?'

গগন জোরে জোরে হুঁকোয় টান দিতে লাগল।

কেশব একটু চুপ করে থেকে বলল, 'ভরতের কথা বলতে পারি নে, কিন্তু তোমার মেয়ে সিন্দূরের বোধ হয় মনোগত ইচ্ছা ছিল তোমাকে সানাই দিয়ে যাওয়ার।'

গগন বলল, 'ইচ্ছা ছিল? বলে গেছে তোকে?'

কেশব লজ্জিত হয়ে বলল, 'বাঃ, আমাকে কেন বলবে।'

'তবে কাকে বলেছে?'

কেশব বলল, 'কাউকেই বোধ হয় বলে নি। সব কথাই কি মুখ ফুটে

মানুষ বলতে পারে? মুখের ধরণ-ধারণ দেখলেও তো বোঝা যায়। রাত পোহালে তোমার সানাইর দরকার হবে তা বুঝি জানে না সিন্দুর?'

দলের বায়না সম্বন্ধে হঠাৎ এবার সচেতন হয়ে উঠল গগন। সত্যিই তো! রাত পোহালে ঠিক দরকার না হলেও কাল বাদে পরশুই দরকার হবে সানাইয়ের। তার কোন ব্যবস্থাই করা হয় নি।

গগন কোন কথা না বলে চিন্তিতভাবে হুঁকো টানতে লাগল।

কেশব বলল, 'রাত হল। আমি এবার এগোই ঢুলী খুড়ো, সানাইটা তুমি রেখে দাও তাহলে।'

মেঝের ওপর সানাইটা রেখে কেশব উঠে দাঁড়াল।

এক মুহূর্ত নিজের মনে কি ভাবল গগন, তারপর হুঁকোটা থামে ঠেস দিয়ে রেখে সানাইটা তুলে নিয়ে বলল, 'কেশব।'

'কি বলছ?'

গগন বলল, 'হাত পাত। এ সানাই তোর কাছেই থাক।'

কেশব বিস্মিত হয়ে বলল, 'আমার কাছে?'

গগন বলল, 'হ্যাঁ, তোর কাছেই, আমি সানাই রেখে কি করব? আমি তো আর বাজাতে জানি নে, তুই রাখ।'

'আমি?'

'হ্যাঁ, তুই। আসলে আমার নাম করে সানাই তোকেই দিয়ে গেছে সিন্দুর।'

কেশব লজ্জিত হয়ে বলল, 'কি বলছ তুমি। আমাকে কেন দিয়ে যাবে?'

গগন বলল, 'আমি ঠিকই বলছি কেশব ও সানাই তোর জন্যেই রেখে গেছে সে।'

কেশব আপত্তির সুরে বলল, 'হ্যাঁ, রেখে গেছে না আরও কিছু। বলে গেছে নাকি তোমাকে?'

গগন মৃদু হাসল, বলল, 'সব কথাই কি মানুষ মুখ ফুটে বলতে পারে? ধরণ-ধারণ দেখেও বুঝতে হয়। সিন্দুর তো জানে রাত পোহালে আমার কেবল সানাইর নয়, সানাইদারেরও দরকার হবে', বলে সানাইটি কেশবের হাতে গুঁজে দিতে দিতে হঠাৎ ধরা গলায় গগন বলে উঠল, 'দান করা মেয়ে তো ফিরিয়ে নিতে পারি নে কেশব, তাহলে নিতুম। কিন্তু বিদ্যার তো আর জাত নেই, ছোঁয়াছুঁয়ি বাছবিচার নেই। সেই বিদ্যায় সেই গুণ আমি হাতে ধরে তোকে দিচ্ছি, অনাদর করিস নে। আজ থেকে আমার আসল জামাই আর

ভরত ঢুলী নয়', বলতে বলতে সানাইসুদ্ধু কেশবের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল গগন। সিন্দুরের নরম সুন্দর হাত নয়, তার বাবার শুকনো খসখসে লোমভরা হাতের থাবা। তবু কিসের এক অপূর্ব স্পর্শে কেশবের সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হয়ে উঠল। যে কথা মুখ ফুটে সিন্দুর বলতে পারে নি, যে কথা মুখ ফুটে গগন বলতে পারে নি, বলতে বলতেও থেমে গেছে, সে কথা কেউ আর কিছুতেই গোপন রাখতে পারবে না। মাধবদাসের আঙিনায় বসে সানাইতে যখন সুর ধরবে কেশব তখন মুহূর্তের মধ্যে সুরে সুরে সে কথা আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়বে। আজ থেকে গগনের আসল জামাই যে কে তা কি জানতে আর বাকি থাকবে কারও ?